রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ভাবনা এবং *গোরা* উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

এম. ফিল উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গার্গী বিশ্বাস

পরীক্ষার ক্রমিক নম্বর: MPBE194008

ক্লাস রোল নম্বর: ০০১৭০০১০৩০০৮

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৩৩৪৬৬(২০১৫-২০১৬)

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক:

অধ্যাপক শেখর সমাদ্দার

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

মে ২০১৯

JADAVPUR UNIVERSITY

KOLKATA-700032

Department of Bengali

This is to certify that the following papers continue original research on **"রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ভাবনা এবং *গোরা* উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা"** by Gargi Biswas to be submitted in order to fulfill partial requirement of degree of M. Phil (Bengali). I further certify that neither this dissertation nor a part of it has been submitted in any other University for any diploma or degree.

Head	Supervisor
---	---
Dept. of Bengali	Dept. of Bengali
Jadavpur University	Jadavpur University

প্রস্তাবনা

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল স্তরের ছাত্রী হওয়ার সুবাদে অন্যতম একটি প্রধান ক্ষেত্র গবেষণাপত্র, যেখানে আমরা কাজ করেছি একবিংশ শতাব্দীতে *গোরা*-র প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। আমাদের সন্দর্ভটির শিরোনামঃ 'রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ভাবনা এবং *গোরা* উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা'।

পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় পাঠ্য বই-এ আমরা পড়ি 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান/ মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ'। পংক্তি দুটি পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়েছে, আলোচনা হয়েছে কখনো ভারতবর্ষ এমনও ছিল যখন হিন্দু মুসলমানকে মানুষ নয়, ধর্ম দিয়ে বিচার করত(যে প্রেক্ষাপটে কবিতাটি রচিত)। ভারতবর্ষের অদূর অতীতের অবস্থা কল্পনা করে আমরা আশঙ্কিত হয়েছি। অন্তত যে সময় কবিতাটি পড়েছি তখন ভেবেছি, এই সংকীর্ণ রূপের থেকে, আগের অবস্থা থেকে ভারতবর্ষের রূপ ভালো আছে। সময়টা প্রায় ২০০৪-০৫ সাল। এরপরে অবশ্য এই ঘটনা নিয়ে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

এই ঘটনার পরে প্রায় এক দশক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। বিদ্যালয়ের গন্ডী পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠে পা রাখার সুযোগ এসেছে। কিন্তু এই সময়কালে ভারতবর্ষের রূপ যে ভয়াবহ চেহারা ধারণ করেছে, তা কল্পনাতীত। এর আগেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এই দাঙ্গার রূপকে কখনোই মেলানো সম্ভব হয়নি। তবে, এই চিন্তাকে ক্রমে আরো ভাবিয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ চিন্তা' স্নাতকোত্তর স্তরে বিশেষ পত্রে পড়তে গিয়ে অধ্যাপক মহাশয়দের বক্তৃতা শুনতে শুনতে পূর্বের চিন্তা কখনো জেগে উঠেছে। একই সঙ্গে দৈনন্দিন সংবাদপত্র, সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকায় এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ধরণের দাঙ্গার সংবাদ উঠে এসেছে, সেক্ষেত্রে মনে হয়েছে

ভারতবর্ষের এ এক প্রকৃতই সংকটের রূপ। এই চিন্তাকে ঋদ্ধ করেছে বিভাগীয় পরীক্ষার প্রশ্ন এবং এম ফিল স্তরে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন। এখান থেকেই এই গবেষণা সন্দর্ভটির প্রতি আগ্রহ জন্মায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *গোরা* উপন্যাসে যে উগ্র জাতীয়তার পরিবর্তে পরিণত ভারত ভাবনার কথা অথবা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা প্রেরণ করতে চেয়েছেন দেশবাসীর কাছে আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে, একশো বছর পরেও ভারতবর্ষের সংকীর্ণ রূপের কি পরিবর্তন হয়েছে, এরই সন্ধান করা গবেষণা পত্রটির তাগিদ, এমন বলা যেতে পারে। যে উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একশো বছর আগে সমস্যাকে চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমাধানের পথ বলেছিলেন, সেই উপন্যাসের সমস্যা বর্তমান কালেও দূর হয়ে যায়নি। বরং, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা ক্রমাগত সংক্রামিত হচ্ছে এমন মনে করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে *গোরা* উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান কালেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমানের সময়কালে গোরা উপন্যাস কোন কারণে প্রাসঙ্গিক তাকে আলোচনা করাই সন্দর্ভ পত্রটির উদ্দেশ্য।

সন্দর্ভপত্রটিকে যথাযথ অধ্যায় বিভাজনের মধ্য দিয়ে বর্তমান শতাব্দীর সংকটের রূপটিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হল। কিন্তু, এরপরও কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গেল স্বীকার করেও সংকটাবস্থা থেকে মুক্তি যে সম্ভব তা এখানে অবলোকন করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

‘রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ভাবনা এবং *গোরা* উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা’ বিষয়ে কাজটি করতে গিয়ে আমি অনেকের কাছে বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। সেক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কথা, যেখানে আমি *গোরা*-র প্রাসঙ্গিকতার উপর সন্দর্ভপত্রটি করার সুযোগ পেয়েছি। দ্বিতীয়ত, ঋণ স্বীকার করতে হয় আমার তত্ত্বাবধায়কের কাছে, যিনি আমাকে এই কাজটি করার অনুমতি দিয়েছেন। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপকদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত সন্দর্ভপত্রটির গঠনে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে। বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানিয়ে এবং আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ও গবেষক নীলেশ কুমার সাহা। এছাড়া বিশেষ ভাবে ঋণ স্বীকার করতে হয়, বিভাগীয় গ্রন্থাগারের কাছে। কাজটি করতে অনেকাংশে সাহায্য করেছেন মাননীয়া আইভি আদক এবং হরিশ মন্ডল মহাশয়। নতুন পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে নতুন ভাবনা-চিন্তা করতে সহায়তা করেছে কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র। মাননীয় সন্দীপ দত্ত মহাশয়ের কাছে এ বিষয়ে কৃতজ্ঞ। এছাড়া, শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র দত্তের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা বই আমাকে ব্যবহার করতে দেওয়ার কারণে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কাজটি করতে গিয়ে বন্ধুদের থেকে প্রয়োজনীয় বই এবং মতামত নেওয়ার কারণে আমি উৎসাহ পেয়েছি। এছাড়া প্রযুক্তিগত কিছু ক্ষেত্রে সায়নী রায় এবং হৈমন্তী চন্দের থেকে সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা:..... 1-5

প্রথম অধ্যায়: *গোরা* রচনার পটভূমি..... 6-15

দ্বিতীয় অধ্যায়: হিন্দু-ব্রাহ্ম বিতর্ক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ..... 16-38

তৃতীয় অধ্যায়: *গোরা* উপন্যাসে নিবেদিতা এবং বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ..... 39-60

চতুর্থ অধ্যায়: রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার চিন্তা এবং *গোরা*-র প্রাসঙ্গিকতা.. 61-84

উপসংহার: 85-88

গ্রন্থপঞ্জি: 89-93

ভূমিকা

গোরা উপন্যাসে স্বদেশভাবনা একটি বহু আলোচিত বিষয়। রবীন্দ্র সময়পর্বে এবং রবীন্দ্রোত্তরকালে *গোরা*-র স্বদেশভাবনা, জাতীয়তাবোধ এবং আন্তর্জাতিকতার ধারণা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় যেমন আলোচনা হয়েছে, তেমনি গ্রন্থাকারেও তা প্রকাশিত হয়েছে। এই সন্দর্ভপত্রটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র *গোরা* উপন্যাসের 'স্বদেশচিন্তা'কে উপস্থাপন করা নয়। মূল উদ্দেশ্য, যে উপন্যাস প্রথম প্রকাশকালের শতবর্ষ অতিক্রম করে গেছে, সেই উপন্যাস বর্তমান শতাব্দীতে কতটা প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরা।

গোরা উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রবাসীতে রচিত হয় ১৯০৭ সালের আগস্ট(১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র) মাসে। ৩২ কিস্তিতে ১৯১০ সালে(১৩১৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র) মাসে *গোরা* উপন্যাস লেখা শেষ হয়। অর্থাৎ *গোরা* উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন প্রায় তিন বছর সময়কাল ধরে। এই সালেই *গোরা* প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমসময়ে অর্থাৎ যখন দেশে ব্রিটিশ শক্তির প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলমান বিভেদ দাঙ্গাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এমন আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ *গোরা* রচনা করছেন। চেতনাসম্পন্ন ঔপন্যাসিক তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীতে উগ্র জাতীয়তাবাদের অবসানের বাসনাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন উপন্যাসে। তিনি এই সকল কিছুর উর্ধ্বে এক বিশ্বমানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছেন। সেই কারণেই গোরা চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসের নায়ক চরিত্র গোরাকে এক আদর্শ পুরুষ হিসাবে কল্পনা করে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। যদিও যে সময়কালে তিনি উপন্যাস রচনা করছেন এবং যে সময়কালকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন--- সেই দুটি সময়কাল এক নয়; অর্থাৎ, তিনি যখন উপন্যাসটি রচনা করছেন তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে উপন্যাসের কাহিনিতে হিন্দু-ব্রাহ্ম

সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিতে যে সময়কাল রচিত হয়েছে সেই সময়ে রচনাকালের সমস্যা আসা সম্ভব নয়। তবু এরই মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধকে নস্যাৎ করে বিশ্বমানবতার ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

লক্ষ্য করার বিষয়, উপন্যাসটি ইতিমধ্যে প্রথম প্রকাশকালের শতবর্ষ অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়েও সেই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারেনি বর্তমান সমাজ। সেই বিভেদের চেহারার এখনো বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। বর্তমান সময়েও *গোরা*-র ভারতভাবনা একবিংশ শতাব্দীর ভারতভাবনার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে *গোরা* যে ভীষণ রকম প্রাসঙ্গিক, তাকে প্রতিষ্ঠা করা সন্দর্ভ পত্রটির উদ্দেশ্য।

সামগ্রিক বিষয়টিকে যথাযথ আলোচনার স্বার্থে সন্দর্ভ পত্রটিতে চারটি অধ্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা* রচনার পটভূমি**। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কেমন সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ *গোরা* রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এত দীর্ঘ একটি উপন্যাস রচনার তাগিদ কি ছিল, তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ *গোরা* রচনার পূর্বে কোন মতামতের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়ে এই বৃহতাকারের উপন্যাসটি রচনাতে সক্ষম হন। এখানে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখার পরে সেই মানসিকতায় ক্রমে ক্রমে উপন্যাসের রূপ নিয়েছে। তৎকালীন ভারতবর্ষের যে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে প্রকাশ পাচ্ছিল, তারই সম্ভাব্য সমাধান তিনি *গোরা* উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন। কেমন মানসিকতার স্তর অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ *গোরা* রচনার মানসিকতায় পোঁছে, *গোরা* রচনার পটভূমি স্থাপন করলেন তারই আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, **হিন্দু-ব্রাহ্ম বিতর্ক ও অন্যান্য**। মূলত *গোরা* উপন্যাসের কাহিনিতে যেহেতু হিন্দু-ব্রাহ্ম সমস্যা আলোচিত হয়েছে, তাই এখানে অধ্যায় বিভাজনে এই অংশটি রাখা হয়েছে। হিন্দু-ব্রাহ্ম বিভেদের মধ্য দিয়েই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের রূপটিকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হিন্দু-ব্রাহ্মধর্ম সূচনার ইতিহাসকে খানিক আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে, হিন্দুধর্মে প্রথমে এই বিভেদ ছিল না। পরবর্তীতে, হিন্দুধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাসী হয়, এবং ধীরে ধীরে বিভেদ আরো দৃঢ় হয়। এই অবতারবাদের বিশ্বাসের প্রশ্ন নিয়েই হিন্দুধর্মের প্রতি বিতর্কের শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। নবজাগরণের সময় রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং সংকীর্ণ হিন্দুধর্মের প্রতিবাদস্বরূপ ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মধর্মে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির প্রতিবাদ করা হয়। যাঁরা প্রতিবাদে মূল অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তায় গোঁড়ামিকে রক্ষা করার স্বল্প প্রবণতা দেখা গেলেও রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন গোঁড়ামির প্রতিবাদ করে সংকীর্ণতা দূর করে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এই ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব ছিল। *গোরা* তে তা আলোচিত হয়েছে। কেশবচন্দ্রের আদর্শই যে *গোরা*-কে ঋদ্ধ করেছে সে প্রসঙ্গই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এরসঙ্গে আলোচিত হয়েছে উপন্যাসে বর্ণিত বিভেদের নানা সংকীর্ণ রূপ, যেমন--- তা কখনো হিন্দু-ব্রাহ্ম সমস্যার আকার ধারণ করেছে, কখনো হিন্দু-মুসলমান সমস্যার রূপ, কখনো জাতিভেদের সমস্যা ইত্যাদি সমাজের যে ব্যাপক সমস্যাকে তুলে ধরেছে, সংকীর্ণ জাতীয়তাকে নির্দেশ করেছে, তা-ই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ সংকীর্ণ জাতীয়তারই নানা রূপ এই অধ্যায়ে পাঠ্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, ***গোরা* উপন্যাসে নিবেদিতা এবং বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।** এই অধ্যায়ে মূলত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে গোরা চরিত্রের আড়ালে কোন বাস্তবিক চরিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে বলার চেষ্টা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যে অরাজক বিশৃঙ্গল পরিস্থিতিতে গোরা চরিত্রের সৃষ্টি করছেন, তার আড়ালে উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা। এক্ষেত্রে বলা যায়, এমন এক আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের চরিত্রকেই বেছে নিয়েছেন যাঁরা দেশের প্রকৃত বীর সন্তান। স্বদেশের কল্যাণে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন। যাঁরা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা নয়, তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবতাবাদেরই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। পবিত্র এক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার স্বপ্নে ভারতবাসীকে জাগ্রত করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গোরা চরিত্রের আড়ালে বিবেকানন্দের ভাবমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। যদিও এ নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। সেই দ্বন্দ্বের অবসানও অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে। বিবেকানন্দের গদ্য-প্রবন্ধ, কবিতা, চিঠিপত্রের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গোরা চরিত্রের আড়ালে বিবেকানন্দেরই ভাবমূর্তি প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যে 'দেশনায়ক'এর সন্ধান করছিলেন গোরা চরিত্রে তেমনি এক দেশনায়ক গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, **রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার ভাবনা এবং বর্তমান সময়ে *গোরা* উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা।** এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার কথা। রবীন্দ্রনাথ জীবনকালের কোন পর্ব থেকে রাজনৈতিক রচনা লেখায় উৎসাহী হলেন। কোন তাগিদে তিনি রাজনৈতিক প্রবন্ধ কবিতা গল্প উপন্যাস লিখলেন। কোন মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি *গোরা* রচনা করলেন। *গোরা*-র মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে বিশ্বমানবতার বার্তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন, সেই কথাই আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে, *গোরা* উপন্যাস রচনার শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে, অথচ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সমস্যা কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর উন্নত প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের যুগেও মানবমনের সংকীর্ণতা দূর হয়নি। বরং ক্রমে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে বর্ণে বিভেদকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এই সময় ভারতবর্ষের কাছে এক সংকটের সময়। এর সমাধান আমাদেরই খুঁজতে হবে। এই সংকটের কালে গোরা সমাজের প্রাসঙ্গিক আদর্শ চরিত্র। গোরা চরিত্র বর্তমান যুগের অন্যতম প্রধান আদর্শ চরিত্র। যার ভাবনা এই তমসাঘন সময়কে আলোর দিশা দেখাতে পারে। যেখানে বিশ্বমানবতার বাণী পারে সংকীর্ণ এই জাতীয়তাবাদ থেকে দূরে সরাতে, সংকীর্ণতা দূর করতে।সমাজে গোরার মত চেতনার মানুষেরও তাই হয়তো বড়ো প্রয়োজন। এখানেই *গোরা*-র সার্থকতা এবং বর্তমান সময়েও তা ভীষণরকম প্রাসঙ্গিক। এই নিয়েই চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যে সংকট নাগিনীর মতো বিষাক্ত করছে এই পরিবেশ, তার নাশ আবশ্যক। এই সাম্প্রদায়িকতার বিভেদ থেকে সমাধানের পথ প্রয়োজন। একশো বছর আগে যে চেতনা চিন্তাশীল প্রগতশীল মানুষের মধ্যে এসেছিল, যে সমস্যা দীর্ঘদিন আগে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে, তবু তার সমাধান হওয়ার পরিবর্তে ক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, এ একবিংশ শতাব্দীর 'অভ্য' সমাজব্যবস্থায় ব্যাপক এক সংকট। এই সংকটের সমাধান বড়ো প্রয়োজন। যেমন অন্ধ জাতীয়তা থেকে বিশ্বমানবতার ভাবনা *গোরা* তে আলোচিত হয়েছে, তেমনি এক বিশ্বমৈত্রী এই বাসভূমির কাছে প্রয়োজনীয়। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা পারে এই সংকট দূর করতে, যা *গোরা* তে বলার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এখানেই বর্তমান শতকেও গোরার প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম।

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা* রচনার পটভূমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের(৭মে, ১৯৬১-৭আগস্ট, ১৯৪১) জীবনকালের প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে *গোরা*(১৯১০) উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *গোরা* উপন্যাসের প্রথম কিস্তি লেখা শুরু হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে এবং তা সম্পূর্ণ হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। প্রায় তিনবছর ধরে *গোরা* প্রবাসী পত্রিকায় ৩২ কিস্তিতে প্রকাশ পায়। *গোরা* রচনাকালের সময় সামাজিক প্রেক্ষাপটের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে লক্ষ্য করা যায়, তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষভাগ, এক অরাজক সমাজব্যবস্থা চারিদিকে গ্রাস করে রয়েছে। এমন এক পরিস্থিতির ফসল 'গোরা'। তবে, একবছরের চিন্তার প্রকাশ এই উপন্যাস নয়। যে উপন্যাসের ব্যাপকতা এত বিস্তৃত তা দীর্ঘকালীন সুচিন্তিত ভাবনার ফল। দীর্ঘদিনের জীবনাভিজ্ঞতা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক অরাজকতা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবন্ধ(ব্যাধি ও প্রতিকার, প্রবাসী, ১৩১৪ শ্রাবণ; মা ভৈঃ, অত্যুক্তি, ঘুষাঘুষি, সফলতার সদুপায়, সমস্যা, স্বদেশী সমাজ) গান ছোটোগল্প কবিতার(নৈবেদ্য) মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে যেন 'গোরা' উপন্যাসে পূর্ণতা পেয়েছে এমনটা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের *গোরা* রচনার প্রেক্ষাপটও তাই যথেষ্ট পরিকল্পনামূলক--- একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু এই অন্তরের তাগিদের পরেও এক বাইরের তাগিদ *গোরা* রচনার অন্তরালে ছিল।

রবীন্দ্রনাথের কন্যার বিবাহের(১৩১৪) সময় অর্থের খুব টানাটানি চলছিল। এইসময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীর জন্য একটি গল্প লিখে দিতে বলেন এবং কিছু টাকাও পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ 'মাস্টারমশায়' গল্প লিখে পাঠান। দুই কিস্তিতে তা প্রবাসীতে প্রকাশিতও হয়। কিন্তু এরপরেও তাঁর মনে হতে থাকে যে পরিমাণ অর্থ তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা একটি

গল্পের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এরপরই তিনি *গোরা* রচনার কাজে হাত দেন। এমনকি কনিষ্ঠ সন্তানের মৃত্যুর পরেও নিয়মিত 'গোরা'র কিস্তি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

'গোরা' উপন্যাস রচনার সময়কালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, বাংলার আন্দোলন যে পথে চলছে সেই পথে ভারতবাসীর মঙ্গলসাধন হওয়া সম্ভব নয়। জাতীয়তার সে সংকীর্ণ রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই রূপে তিনি আশঙ্কিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বিশ্বমানবতার ধর্মে মানুষ উত্তীর্ণ হতে না পারলে জাতিধর্মের উষরক্ষেত্রে তাকে আত্মনাশ করতে হবে। এই বোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথের *গোরা* রচনার উদ্দেশ্য। একজন 'আদর্শ-পুরুষ' তিনি সৃষ্টি করতে চাইছিলেন যেন। রবীন্দ্রনাথ গোরাকে সৃষ্টি করেছিলেন। একই উপন্যাসে আরও কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, যেমন--- পরেশবাবু অথবা আনন্দময়ী। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, উপন্যাসে গোরা অথবা পরেশবাবু অথবা আনন্দময়ীর চরিত্র এতটাই স্বচ্ছ, বিশেষ করে পরেশবাবু এবং আনন্দময়ী চরিত্র দুটি; যেকারণে তাদের বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে বেশ কয়েকক্ষেত্রে খানিক অসুবিধা হয়ে পড়ে। তাদের কথোপকথন বাস্তব পরিস্থিতির মতো না হয়ে অনেকখানিই তা আদর্শমূলক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, উপন্যাসের কথনরীতি যত না স্বাভাবিক, তারও বেশি ইচ্ছাকৃত ভাবে অনেকক্ষেত্রে তাকে পরিকল্পনামূলক ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, আদর্শ চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে সমাজে বিশেষ কোনো বার্তা প্রেরন করা। সমাজের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আদর্শ চরিত্রের দ্বারাই যেন রবীন্দ্রনাথ একধরণের সমাধানের পথ খুঁজে পেতে চাইছিলেন। তরুণ সমাজের জাগরণ চাইছিলেন। সমাজের যে বিভেদ তা তিনি 'গোরা' উপন্যাসে যেমন গোরার মনোভাবের রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে কাহিনির অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়েছেন, তা যেন কোথাও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথেরও মনোভাবের সঙ্গে

মিলে যায়। অর্থাৎ, উপন্যাসের শেষে যে বিশ্বমানবতার ধর্মে গোরা উত্তীর্ণ হয়, তাকেই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করতে চাইছিলেন। নিজস্ব রচনাতেও তিনি যেমন 'দেশনায়ক'এর সন্ধান করছিলেন, কতকটা সেই কারণেও যেন গোরা চরিত্রের এবং গোরা চরিত্রের প্রয়োজনে এমনই অন্যান্য চরিত্রদের সৃষ্টি করছিলেন। বলা যায়, নিজ অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনারই ফলিত রূপ *গোরা*। *গোরা* রচনার প্রেক্ষিত সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রী রবীন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেছেন,

> *গোরা উপন্যাসের প্রেক্ষিত রচনা করেছে রবীন্দ্রনাথেরই বাল্য-কৈশোর থেকে ১৯০৯ সালে উত্তীর্ণ মানসিকতার নানা-স্তর। গৌরমোহনের পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের চিত্ত পরিবর্তনের ছককেই উদ্ঘাটিত করেছে।*[১]

'গোরা' রচনার পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করতে হয়, 'গোরা' রচনার সময়পর্ব সম্পর্কে। গোরার জন্ম মিউটিনির সময়ে, অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের সময়ে, সময়কাল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়।

> *কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "তখন মিউটিনি। আমরা এটোয়াতে। তোমার মা সিপাহিদের ভয়ে পালিয়ে এসে রাত্রে আমদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ...সেই রাত্রেই তোমার মা তোমাকে প্রসব করে মারা গেলেন। তারপর থেকেই তুমি আমাদের ঘরে মানুষ হয়েছ।*[২]

কিন্তু যে সমস্যার কথা অর্থাৎ যে হিন্দু-ব্রাহ্ম সমস্যার কথা সমগ্র উপন্যাসের প্রেক্ষাপট জুড়ে আলোচিত হয়েছে তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। বাংলাতে যখন নবজাগরণের সূচনা হচ্ছে, তখন রামমোহন রায়ের মতো এক ব্যক্তিত্ব সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের দ্বারা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মধর্মের সূচনা ঘটাচ্ছেন। অর্থাৎ, হিন্দু-ব্রাহ্ম সমস্যার সূত্রপাতই হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। অন্যদিকে উপন্যাস রচনার সময়কাল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। উপন্যাসের

শেষে যে উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ পৌঁচেছেন সেই উপলব্ধি ১৯০৬-০৭ সালের আগে হওয়া সম্ভব নয়। জ্যোতির্ময় ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> *যদিও গোরার ঘটনাকাল ১৮৮২-৮৩, তবু মনে রাখতে হবে, গোরা তথা রবীন্দ্রনাথের যে ভারতবোধ উপন্যাসের উপসংহারে প্রতিষ্ঠিত, রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ১৯০৬-০৭ সালের আগে সেই উপলব্ধিতে উন্নীত হতে পারে না, বস্তুত তা হয়ও নি। সেই সূক্ষ্ম বিচারে গোরার ঘটনাকালের বিন্যাসের সঙ্গে গোরা উপন্যাসের ফলশ্রুতি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বস্তুত তা কালানৌচিত্ত দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে।*[৩]

কিন্তু, যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার তা হল, যে প্রেক্ষাপটে ‘গোরা’ রচিত, সেখানে দুটি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতার বোধকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। মূলত দুটি সময়ের দুটি মূল গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ‘গোরা’ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। যথা, উপন্যাস জুড়ে যে সমস্যা বলা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে হিন্দু-ব্রাহ্ম সমস্যা। কিন্তু, যে সময়কালে উপন্যাসটি রচিত হচ্ছে সেই সময় ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে আরও বড়ো আকারের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব মানবজাতিকে এক ভয়াবহ করালগ্রাসে আচ্ছাদন করছে। যেখানে মানুষের মানবধর্মের পরিচয়ের আগে তার কাছে জাতি ধর্ম বর্ণভেদ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এই কদর্য চেহারারই রবীন্দ্রনাথ তীব্র নিন্দা করেন। সেই নিন্দার প্রতিবাদের অন্যতম ফলাফল ‘গোরা’ উপন্যাস। বিশ শতাব্দীর শুরু থেকেই জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম-বোধ হিন্দুত্বের মধ্যে নতুন আশ্রয় নিচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ অচিরেই এই সংকীর্ন জাতীয়তার রূপ বুঝতে পারেন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ প্রেমে বিশ্বাসী হন। এই গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবতার ধর্মে পৌঁছনোই যেন উপন্যাসটির মূল লক্ষ্য ছিল। গোরার মধ্য দিয়ে এই বার্তা তিনি পৌঁছে দেন। গোরা চরিত্রের গোঁড়ামিকে তুলে ধরে যেমন তিনি সংকীর্ণ পথকে প্রথমে নস্যাৎ করেন; তেমনি তার

বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধিকে পাঠকের কাছে গভীর বার্তা হিসাবে তুলে ধরেন অনায়াসে। অতএব, বলাই যায় *গোরা* শুধুমাত্র শিল্পীমনের কল্পনার বুনন ছিল না। *গোরা* যথেষ্ট উদ্দেশ্যমূলক সমাজ-সচেতন রাজনৈতিক একটি উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> *গোরার জন্ম শুধু ১৮৫৭ সালে বা তার ধারেকাছেই নয়, গোরার জন্ম আরো আগে, দেবেন্দ্রনাথ-রাজনারায়ণ বসুর ভাবলোকে, ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের মঞ্চে আবার বিবেকানন্দের প্রয়াণের মুহূর্তে, ১৯০২ সালেও। গোরার জন্মস্থান শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও, ভিন্নতর গোলার্ধেও। গোরা শুধু ভারতীয়ই নয়, বিশ্বভারতীয়।*[৪]

গোরা উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক সামাজিক দায় ব্যাপক চেহারায় ধরা পড়ে। তিনি নিজেই ছিলেন ভীষন দূরদর্শী চিন্তাশীল এক ব্যক্তিত্ব। সমাজের প্রতি দায়বোধ সচেতনতা সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শুধুমাত্র 'Art for Art sake' এ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, চারপাশের মানুষের জীবনের সঙ্গে নাড়ির যোগ রেখে শিল্প সৃষ্টি করতে হয়। *গোরা* তাঁর এই উপলব্ধির প্রকাশ। একজন শিল্পী হিসাবে তিনিও মনে করতেন, যে কোনও সৎ শিল্পীকেই সমাজের অংশীদার হতে হবে। পরিবর্তনশীল এই সমাজব্যবস্থার সঙ্গে, দিকে দিকে প্রসারিত আন্দোলনের সঙ্গে গভীর সংযোগ না-রাখলে কোনও শিল্পীর দ্বারা শিল্প নির্মাণের সাধনা সম্ভব নয়। প্রতি মুহূর্তে একজন শিল্পীকে সমাজের ভাঙা-গড়া, সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। সমাজের সামগ্রিক রূপ উঠে না আসলে সমস্ত শিল্পের সৃষ্টি নিরর্থক হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। *গোরা* রচনায় এই গভীর চিন্তাশীল ও প্রতিনিয়ত অনুসন্ধানী শিল্পী এবং সমাজ-সচেতন রবীন্দ্রনাথকেই পাওয়া যায়। তাঁর রচনার মধ্যে, তৎকালীন লেখা স্বদেশী প্রবন্ধ, গান, কবিতার মধ্যে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্য বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে।

এখানে একজন সমাজদরদী মানবদরদী হয়েই না, শিল্পের প্রতি যথাযথ মর্যাদা রেখেই তিনি *গোরা* রচনা করেছেন। যার প্রতি বাক্যে তাঁর সমাজভাবনার সুদৃঢ় মনোভাব এবং স্বদেশ প্রেমের প্রকাশের উদ্দেশ্য পটভূমির অন্তরালে ধরা পড়েছে। *গোরা* সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নেপাল মজুমদার বলেছেন,

> *গোরা চরিত্র যেন রবীন্দ্রনাথের নিজেরই আত্মকাহিনী। গোরার শুরু ধর্মে ও সাম্প্রদায়িকতায়, সমাপ্তি ধর্ম ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতায়। গোরার শুরু হিন্দু জাতীয়তাবাদে, সমাপ্তি বিশ্বমানবতায়।*[৫]

গোরা রচনার পটভূমিতে '*ব্যাধি ও প্রতিকার এর* প্রসঙ্গ উল্লেখ করতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' লিখছেন ১৯০৭ সালে, অর্থাৎ 'গোরা' লেখার সময়কাল। একথা বলাই যায়, তিনি 'ব্যাধি ও প্রতিকার' এ যে সমস্যাকে চিহ্নিত করে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন, *গোরা*তে সেই সমস্যারই কাঙ্খিত সমাধানের কথা বলেছেন। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে দেশের অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর কিছু গুরুতর সমস্যার আলোচনা করেছেন। যেহেতু *গোরা* রচনার কাছাকাছি সময় এই প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, সেই কারণে ধরে নেওয়া যায়, এই রচনায় স্রষ্টার মানসিক প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী রচনায় প্রভাব ফেলবে। 'গোরা' এর ব্যতিক্রম নয়। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

> *আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলিমদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।*[৬]

অথবা,

হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে; এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই। ...হিন্দু মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন-একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। ...

আমরা জানি, বাঙ্গলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না--- ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।[৭]

এই প্রসঙ্গে *গোরা* উপন্যাসের পরেশবাবুর মতামতও যেন মিলে যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে,

একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়, ... মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনোই পৃথিবীতে বড়ো হতে পারে না, অন্যের অবজ্ঞা তাদের সইতেই হবে।[৮]

'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে এই বিভেদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

... মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। ...

মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাহাদের অভ্যাস নহে... যাহারা নিজেকেই নিজে খন্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোনোদিন নিষ্কৃতি পাইবে না।[৯]

বলা যেতে পারে, 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধের বক্তব্যই সমান্তরালে *গোরা*-তে যেন আলোচিত হয়েছে। সামগ্রিক ওঠা-পড়া নিয়ে যে সমাজ ভাবে না, শুধুমাত্র বিশেষ কিছু শ্রেণির কথা যে সমাজ ভাবে, সেই সমাজকে তথা সেই সমাজের মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথ তীব্র নিন্দা করেছেন। যে স্বদেশী আন্দোলনের সাপেক্ষে সকলকে একত্র হওয়ার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে, সেই স্বাদেশীকতা যে পূর্ণ নয়, তা তিনি বলেছেন। তিনি সমগ্র দেশ জাতি ধর্ম বর্ণের মানুষের মিলনের কথা বলতে চেয়েছেন, যেখানে স্বদেশবোধ সম্পূর্ণ হয়। শ্রেণিভেদে এই স্বাদেশিকতা এই জাতীয়তার বোধ অন্ধ-জাতিপ্রেমের পরিচয় দেয়--- যা তাঁর কাছে আকাঙ্খিত নয়। *গোরা*-তে এই অন্ধ জাতীয়তা বোধেরই মুক্তি ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। *গোরা*-র অন্ধ জাতিপ্রেম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে চিন্মোহন সেহানবিশ বলেছেন,

যে উগ্র জাতিপ্রেম নিজ দেশের মারাত্মক দুর্বলতা সম্বন্ধে অন্ধ এবং অন্য দেশের সদগুণের প্রতি বিমুখ, তার ভ্রান্তি ও অন্তঃসারশূণ্যতা রবীন্দ্রনাথ শুধু অন্য দেশের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেও ঐ সময়ে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছিলেন। সে উপলব্ধির গভীরতা আমরা বুঝি যখন দেখি সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধে শুধু নয়, তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যেও তার আত্মপ্রকাশ ঘটতে।[১০]

গোরা সেই সামাজিক সমস্যার সৃজনশীল রচনার *প্রকাশ। গোরাতে* সংকীর্ণ জাতীয়তার মুক্তি ঘটিয়ে বিশ্বমানবতাবাদের প্রচার করতে চেয়েছেন। সংকীর্ণ মানসিকতা থেকেও তিনি মুক্ত হতে চেয়েছেন। যেখানে মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। নেপাল মজুমদারের কথা এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে,

> *কবির এই বিশ্বজাগতিকতা শুধুমাত্র একটা বোধ ও মানসিক অনুভূতিতেই শেষ হইতেছে না, এই বিশ্ব ঐক্যানুভূতি হতেই বিভিন্ন দেশ জাতি ধর্ম ও গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং মিলন-মিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, এই ছিল কবির বক্তব্য।---আর ভারতবর্ষই হইবে সেই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও 'মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র'।*[১১]

গোরাতে এই সংকীর্ণ জাতীয়তাকে অবজ্ঞা করে বিশ্বমানবতাবাদের প্রতিষ্ঠাই ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যই দীর্ঘ-দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতায় এবং শ্রমে, নানাবিধ নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এমন রচনাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। *গোরা* রচনাকে কোনো মৌলিক রচনা সেই অর্থে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী রচনাগুলি *গোরা*-র পটভূমি নির্মাণে সহায়তা করেছে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয়।

তথ্যসূত্র

১. শ্রী রবীন্দ্র গুপ্ত, "গোরা--- একটি সমীক্ষা", *পশ্চিমবঙ্গ(রবীন্দ্র সংখ্যা),* বর্ষ ২০, সংখ্যা ৪৩-৪৫, ১৯৮৭, পৃ. ৯৭১।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গোরা", *রবীন্দ্র রচনাবলী(তৃতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৬৬১।

৩. জ্যোতির্ময় ঘোষ, *নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ১৯৯৮, পৃ. ৫৬।

৪. তদেব, পৃ. ৫৭।

৫. নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ১৯৮৩, পৃ. ২৮২।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ব্যাধি ও প্রতিকার", *রবীন্দ্র রচনাবলী(পঞ্চম খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৪২১, পৃ. ৭৮১-৮২।

৭. তদেব, পৃ. ৭৮২।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গোরা", *রবীন্দ্র রচনাবলী(তৃতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৪৭২।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ব্যাধি ও প্রতিকার", *রবীন্দ্র রচনাবলী(পঞ্চম খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৪২১, পৃ. ৭৮২।

১০. চিন্মোহন সেহানবীশ, *রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা,* কলকাতাঃ নাভানা, জানুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ৪১।

১১. নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ১৯৮৩, পৃ. ২৮০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দু-ব্রাহ্ম বিতর্ক ও অন্যান্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সময়ে *গোরা* রচনা করছেন, এবং যে সময়কালকে উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেই দুটি সময়কাল একই নয়। যে সময়কালে উপন্যাসটি রচিত তখন ব্রিটিশের প্ররোচনায় হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্ব পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে আবার হিন্দু-ব্রাহ্ম গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। বলা যেতে পারে, এই দুই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে সমান্তরালে রেখে রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তার রূপটিকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব *গোরা* উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে, তার পূর্ব রূপ কিছুটা এই অধ্যায়ে বলা হল। অর্থাৎ, প্রাচীন ভারতে জাতিতে-বর্ণে ভেদ ছিল না।

হিন্দু সমাজ বহু জাতি বহু সংস্কৃতির ফল। হিন্দু শব্দটি এসেছে সিন্ধু থেকে। খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার বছরের মধ্যবর্তী সময় আর্য জাতির আক্রমণে এই সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটে। তবে, আর্য জাতির আগমনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা অন্য রূপ নেয়। ভারতবর্ষে আর্য জাতির আগমণে ক্রমে ক্রমে ধর্ম-জাতি-বর্ণ জন্ম নিতে থাকে। ভারতবর্ষের ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় ঋকবেদে। বেদ থেকে বোঝা যায় এই ধর্ম ছিল বহু ঈশ্বরবাদী। তবে, প্রকৃতিকেই এরা ঈশ্বর রূপে স্মরণ করত। এর পরবর্তী সময় খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ সালে উপনিষদ গড়ে ওঠে মূলত আত্মা ও ব্রহ্মকে কেন্দ্র করে। এই সময়কালেই আধুনিক হিন্দুধর্মের পত্তন ঘটে। একেশ্বরবাদেরও উদ্ভব হয় এই সময়কালেই। এই সময়পর্বেই নৈতিক আচার-বিধিও স্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। এরও বেশ কিছু পরে অবতারবাদের জন্ম হয় হিন্দুধর্মে। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'হিন্দুধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন,

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শেষ দিকে অবতারবাদের বিকাশ ঘটে। ভক্তির পুষ্টি এর পর থেকেই। কেন-না মানুষের পক্ষে উপনিষদের সর্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মের চেয়ে ব্যক্তিরূপে মূর্ত ঈশ্বরকে ভালবাসা অনেকখানি সহজ।[১]

এরপরই হিন্দুধর্ম হয়ে ওঠে পৌত্তলিকতা আশ্রয়ী। নানাবিধ কুসংস্কার নিয়মের বেড়াজালে হয়ে ওঠে আবদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়কালে ভারতীয় উচ্চশিক্ষিত একদল মানুষ জাতীয়তাবাদের আকাঙ্ক্ষায় এবং কুসংস্কার বিরোধী মানসিকতায় প্রথাগত চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। তাঁদের মুক্তচিন্তার গতিশীলতার ফলেই উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের আবির্ভাব ঘটে। উনিশ শতকে বাংলায় যে 'রেনেসাঁস'এর আবির্ভাব হয়েছিল, তার অন্যতম যুগন্ধর মহাপুরুষ ছিলেন রামমোহন রায়। রামমোহনের আবির্ভাবকালে তৎকালীন হিন্দু সমাজ নবাগত মিশনারীদের কার্যকলাপে এবং রক্ষনশীল গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়ায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হচ্ছিল। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে সরাসরি ধর্ম-রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবই মূলত উনিশ শতকের চেতনাকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছিল। মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজকে সর্বপ্রথম আঘাত করেছিলেন রামমোহন রায়। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে হৃদয়োৎসুক রসস্পৃহার দ্বারা সাদরে আমন্ত্রণের আহ্বানও শোনা গিয়েছিল তাঁরই কর্মোদ্যমের মধ্য দিয়ে। তাঁর স্বাধীন বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার মধ্য দিয়েই ভারতের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ধারাটি সূচিত হয় এমন মনে করা যেতে পারে। রক্ষণশীল মানসিকতায় আঘাত করে নতুন পথের দিশা রামমোহন রায়ই দেখিয়েছিলেন। অতএব, নতুন একটি মতাদর্শের আকস্মিক অভ্যুদ্যয় স্বাভাবিকভাবেই সমাজের একদল মানুষের মনে প্রশ্ন তুলেছিল। এই প্রশ্ন-সন্দেহই পরবর্তীতে হিন্দু-ব্রাহ্ম ধর্মের বিতর্কের সৃষ্টির কারণ। এ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং বেদান্তচর্চার অভ্যাস সমাজকে কুসংস্কারের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত হতে অগ্রসর করেছিল। বলাবাহুল্য, বেদান্তচর্চার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম-সম্পর্কীয় আলোচনার জন্য রামমোহন ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই 'আত্মীয় সভা'তেই ব্রাহ্মসমাজের বীজ রোপিত হয়েছিল। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা বিরোধী একেশ্বরবাদের প্রচলন করা। তবে, সেকালের উচ্চশিক্ষিত এবং বিখ্যাত গুণী ব্যক্তিরা সকলেই যে এমন পৌত্তলিকতা বিরোধী হিন্দুধর্মকে মেনে নিতে পেরেছিলেন তা নয়। প্রাচীন নবীনের সংঘাত ছিল যথেষ্ট। রামমোহন রায়ের এই চিন্তাধারার সঙ্গে যাঁরা সহমত ছিলেন না তাঁরা হলেন- দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষ, গোপীনাথ মুনসী প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তবে, সন্ধ্যাকালে আত্মীয়সভাতে যখন বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হত, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হতেন। আত্মীয়সভায় ভাঙন ধরলে রামমোহন রায় মাঝেমধ্যে ধর্মালোচনার জন্য খ্রীস্টিয় চার্চে যেতেন। একদিন চার্চের উপাসনা থেকে ফেরার পথেই তিনি উপলব্ধি করেন মিশনারীদের আর দ্বারস্থ না হয়ে নিজেদের অর্থাৎ স্বদেশী আত্মাভিমান বোধে উদ্ভুত একটি ধর্মকেন্দ্র স্থাপন করবেন। এই মহৎ ভাবনা থেকেই ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সূত্রপাত ঘটে। রামমোহন রায়ের এই প্রস্তাবে সম্মত হন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রমুখ বিদ্বৎজনেরা। *ধর্মকে সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমিরূপে কল্পনার আদর্শকে রূপায়ণের জন্য*[২] এবং খ্রীস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণের প্রচেষ্টার মূলে আঘাত করার অভিপ্রায়ে *(১৮২৮ সাল) ৬ই ভাদ্র দিবসে রামমোহন রায় কলিকাতায় চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসু নামক এক ভদ্রলোকের বাহিরের বৈঠকখানা ভাড়া লইয়া সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন।*[৩] স্থাপিত হয়। ক্রমে চিৎপুর রোডে ব্রাহ্মসমাজের নূতন বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হলে সকল ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সেখানে উপস্থিত থেকে উপাসনায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। *হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানের একাসনে বসে উপাসনার এমন অনুষ্ঠান পৃথিবীর ইতিহাসে আগে আর অনুষ্ঠিত হয়নি।*[৪] তবে,

সামাজিক বাধা কম ছিল না, সমাজ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। একদিকে রক্ষণশীলতা অন্যদিকে নিয়ম ভাঙার খেলা। তৎকালীন সমাজের চিত্র দেখা যেতে পারে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলছেন,

> *ব্রহ্মসভা স্থাপিত হইলে কলিকাতার হিন্দুসমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিল। তাঁহাদের অনেকে রামমোহন রায়ের সভার কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শনের জন্য সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন তাহা নহে, সামাজিক বিষয়ে তাঁহার আচার-ব্যবহার হিন্দুসমাজের লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই সকল বিষয় লইয়া পথেঘাটে, বাবুদের বৈঠকখানায়, রামমোহন রায়ের দলের প্রতি সর্ব্বদা কটূক্তি বর্ষণ হইত।*[৫]

আবার, শিবনাথ শাস্ত্রীর গ্রন্থ থেকেই জানা যায়, সমাজে কত মানুষ কত অস্পৃশ্য ছিল, জাতপাতের কত বৈষম্য ছিল। তাই, হিন্দু-ব্রাহ্মণদের রক্ষণশীলতা চরমে উঠলে তাঁদের প্রায় খানিক জব্দ করতেই একদল বালক রাজপথে 'মুন্ডিতমস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পন্ডিত' দেখলেই তাঁদের বিরক্ত করতে 'আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো' বলে চিৎকার করত অথবা, *এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি*[৬] বলত। এ থেকে সমাজের জাতপাতের বৈষম্যের দিকটি কেমন প্রবল ছিল বোঝা যায়। মনে করা অস্বাভাবিক কিছু না যে, এত কিছুর পরেও স্বদেশী মনোভাবের মধ্য দিয়েই বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠা করা ছিল ব্রাহ্মধর্ম তথা রামমোহন রায়ের অন্যতম লক্ষ্য। তবে, ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের মৃত্যু হলে ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহীদের আগ্রহ হ্রাস পায়। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মধর্মের অপসৃয়মান আন্দোলনকে পুনর্জ্যোতিময় করে তোলেন।

রামমোহন রায়ের নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি উপাসনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রামমোহন তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ স্থিতধী চিন্তাশক্তির দ্বারা অনুভব করেছিলেন

ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি সামাজিক-সংস্কার এবং সামাজিক সামগ্রিক কল্যান এবং দেশীয় রাজনীতির উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। অন্যদিকে নাস্তিক্যবাদও এর সমাধানের পথ নয়। তার ফলেই বিশ্বধর্মের(অর্থাৎ তাঁর ব্রাহ্মধর্ম) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মূলশাস্ত্রগুলিকে রামমোহন রায় সযত্নে অনুধাবন করে অনুভব করেন ধর্ম আসলে অদ্বিতীয়; অনুষ্ঠান বিচিত্র এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের কারণ। দেবেন্দ্রনাথ এই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্রাহ্মধর্মে যোগ দেন ১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর। ব্রাহ্মধর্মে যোগদানের পরে দেবেন্দ্রনাথ যা করেন, তা হল- ব্রাহ্মণ ও শূদ্র যে একত্রে বেদপাঠে অক্ষম ছিল, তিনি তা অপসারণ করেন। যেহেতু, খ্রীস্টধর্ম প্রচার রোধ করা তখনকার শিক্ষিত যুবকদের কাছে অনেক বেশি লক্ষ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; অতএব, দেশের জনগণের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কারণ ঐক্যবদ্ধ না হলে দেশের মুক্তি যে সম্ভব হবে না, একথা রামমোহনের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের উদ্দেশ্যই ছিল সকল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ব্রহ্মোপাসনা করতে পারবে।

> *রামমোহনের সমাজে শূদ্রের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করতেন না; আসলে সে সময়ে কোনো ব্রাহ্মণই শূদ্রসমক্ষে বেদপাঠে রাজি হতেন না। রামমোহন এ নিয়ে মাথা ঘামান নি। তিনি বা তাঁর পার্ষদেরা বেদপাঠ করতেন না। এই বাধা প্রথমে দেবেন্দ্রনাথই অপসারিত করলেন। ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এটি একটি বড়ো পদক্ষেপ।*[৭]

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে দেবেন্দ্রনাথ বেদের দর্শনে আস্থা হারালেন। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাবে পৌত্তলিকতার বিরোধী হয়ে উঠলেন। এমনকি উপনিষদেও সান্ত্বনা পেলেন না। শেষ পর্যন্ত জীবনের এক বাঞ্ছিত মুহূর্তে এসে উপলব্ধি করলেন আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তার পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়েই ব্রাহ্মধর্মের অধিষ্ঠান। ১৮৫৭ সালের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্মের

মূল তত্ত্বগুলি রূপলাভ করেছিল। এই সালেই কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের গতিতে পরিবর্তন আনেন। ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে এ এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মে যোগদান একটি যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কেশবচন্দ্র ছিলেন তেজস্বী, স্থৈর্যবান, ভাবপ্রবণ এবং বিদ্রোহী মানসিকতা সম্পন্ন পুরুষ। পুরোনো সংস্কারকে সরিয়ে নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল তাঁর সংকল্প। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে বিশ বছর বয়স্ক কেশবচন্দ্র অল্পসময়ে শ্রেষ্ঠ বাগ্মীরূপে এবং তার্কিক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মে তারিখে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার সূত্রে এবং অধ্যক্ষসভার কাজে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ সহায়ক রূপে পেলেন। কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে 'সঙ্গতসভা' এবং ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে 'ব্রাহ্মবন্ধুসভা'(অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রদান) স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মধর্মের আদর্শকে জনগণের মঙ্গলার্থে শুধুমাত্র শিক্ষাবিস্তার নয়, সেবাকাজেও কেশবচন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেন। কেশবচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস এবং কর্মোশক্তির উৎসাহ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মের প্রতি নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ স্নেহপ্রবণ হয়ে ১৮৬২ সালের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দেন।

এরপরও অর্থাৎ একই সাধনার উপাসক হওয়া সত্তেও মানবমনের সিদ্ধান্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে—এমন ঘটনা বিরল নয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনও একই উপাসনার উপাসক হলেও তাঁদের নিজস্ব স্বভাবে বিরুদ্ধতা ছিল। কেশবচন্দ্র স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোনো আপোষকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অপরপক্ষে, দেবেন্দ্রনাথ ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়ে সংকীর্ণ ছিলেন—ধর্মসাধনের একমুখিনতা, ধর্মমতের একদেশদর্শিতা, একতন্ত্রতা। এই তিনটি কারণে মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মতানৈক্য ঘটে। বলা যেতে পারে, মহর্ষি

হিন্দুধর্মের প্রতি কর্তব্যপরায়ণরূপে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন অন্যদিকে কেশবচন্দ্র বিশ্বধর্মের ঔদার্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই বার্তাকে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন। এমনই বেশ কিছু মতানৈক্যে মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্রবোধ ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছিল। এর মাত্রা ক্রমে সর্বোচ্চে পৌঁছায় যখন কেশবচন্দ্র সেন জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কেশবচন্দ্র মনে করেছিলেন, যেহেতু সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, অতএব, সকলের সমান অধিকার রয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ যদিও এর বিরোধিতা করেননি, বরং কেশবচন্দ্রের বক্তব্যের বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে যুগদাবীকে মেনে নিয়েছিলেন। এই ঘটনার পরে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে দেবেন্দ্রনাথ নিজে প্রধান আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কেশবচন্দ্রকে উপাচার্যগণের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা করেন।

কেশবচন্দ্রের সংস্কার শুধুমাত্র এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদের পর ‘অসবর্ণ বিবাহ’ তিনি প্রচলন করতে চাইলেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে গুঞ্জরণ ধরা পড়েছিল, ‘অসবর্ণ বিবাহ’এর ফলে সেই চাপা গুঞ্জরণ প্রত্যক্ষ অসন্তোষের চেহারা নিল। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ অসন্তুষ্ট হলেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষির দ্বন্দ্ব ক্রমে বৃদ্ধি পেলে নব্যপন্থীদের সঙ্গে সখ্যতা রাখা তাঁর পক্ষে প্রায় একরকম অসম্ভব হয়ে উঠল। এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই মানসিক আঘাত পেলেও, যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত পূর্বে শুরু হয়েছিল— অনিবার্যভাবে তা সম্পন্ন হল। কেশবচন্দ্র সেন ‘কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ’ থেকে সরে এলে ‘কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ’ ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ’ নামে পরিচিত হয়। দেবেন্দ্রনাথও অনেকখানি সংযত হয়ে ব্যক্তিগত ঈশ্বরসাধনায় মগ্ন হন। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’(Brahmo samaj of India) প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ব্রাহ্মসমাজের (ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ) নামকরণেই স্বাদেশীকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র সেন ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর চিন্তার ব্যপ্তি বৃদ্ধি পায়। শিখ ধর্মের গণতান্ত্রিকতা তাঁর হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্যবোধের চিন্তা তিনি ব্রাহ্মধর্মে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। এই চিন্তার ব্যাপকতার ফলেই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ নাম হয়— 'Brahmo Samaj of India'; বলা যেতে পারে, ভারতীয়তা বোধের বীজমন্ত্র এই সমাজের মধ্য দিয়েই রোপিত হয়েছিল।

কেশবচন্দ্র শুধুমাত্র 'হিন্দু-ধর্ম-সর্বস্বতা'কে প্রাধান্য দিতে চাননি; ব্রাহ্মধর্মের মধ্য দিয়েই তিনি বিশ্বমানবতার বাণীর প্রচার করতে চেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্লোক সংগ্রহ'কে অবলম্বন করে তিনি একটা সংকলন করলেন। সংকলনটিতে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান ইত্যাদি সকল ধর্মের সংক্ষিপ্তসার গ্রহণ করা হল। সকল ধর্মের উর্ধ্বে যে সমন্বয়ের মন্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে—তাকেই কেশবচন্দ্র পালন করতে চেয়েছিলেন তাঁর ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মসমাজের উদারতার মধ্য দিয়েই নর-নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হল কেশবচন্দ্রের উদ্যোগেই। কেশবচন্দ্রের কারণেই স্বদেশপ্রীতির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে উপাসনা ও বক্তৃতার ভাষা হল বাংলা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে কেশবচন্দ্র মানবসংস্কারে তথা সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন, যা 'ভারত সংস্কার সভা' নামে পরিচিত। কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারত সংস্কার সভা' জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। কেশবচন্দ্র সেনের এও এক অভিনব এবং আধুনিক প্রচেষ্টা। এই সভা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ব্যক্তি মানুষকে শ্রদ্ধা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞাত করে। বিবাহ বিষয়ে এখানে পাত্র-পাত্রীর বয়স বেঁধে দেওয়া হয়। এখানেই পাত্রের বয়স ন্যূনতম অষ্টাদশ বছর এবং পাত্রীর বয়স চতুর্দশ বছর অতিক্রম করার কথা বলা

হয়। কেশবচন্দ্র নিজে পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথাকে সমাজের বদ্ধ সংস্কার হিসেবেই মানতেন। ব্রাহ্মধর্মের বিভেদ সম্পূর্ন হলে একদিকে যেমন 'হিন্দু-ধর্ম সর্বস্বতা জাতীয়তাবাদ' প্রাধান্য পেল; অন্যদিকে তেমনই উদার জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করে বিশ্বমানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা হল—যার প্রাথমিক রূপ দান করলেন কেশবচন্দ্র সেন। হিন্দুধর্মের যাবতীয় কুসংস্কার পৌত্তলিকতা গোঁড়ামির সঙ্গে বিভেদ-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম স্বয়ং একটি আদর্শ হয়ে উঠল তৎকালীন ভারতবর্ষীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে।

তবে, কেশবচন্দ্র সেন বিশ্বমানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা করে একদল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী যুবকের কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছিল যেমন সত্য, তেমনই এও সত্য যে দীর্ঘকালের জর্জরিত হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ বিনা বিপত্তিতে তা ঘটতে দেয়নি। কেশবচন্দ্রের 'আমি হিন্দু নই' বক্তব্য 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'কে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' থেকে ব্রাত্য করেছিল এমনটা নয়, সমগ্র হিন্দুসমাজ তাদেরকে ব্রাত্য করেছিল—'ব্রাহ্ম' একটি আলাদা ধর্ম হয়ে সমাজের অন্য একটি শাখাতে পরিণত হয়েছিল। 'হিন্দুসমাজ' ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার দ্বারা সম্পৃক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের চিন্তার প্রবাহ শুধুমাত্র তাঁদের গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; অন্যদিকে ব্রাহ্মধর্ম শুধুমাত্র 'হিন্দুত্ববাদ'এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায়নি—সমগ্র বিশ্বমানবতাবাদের ভাবনায় মানব মনের উৎকর্ষতার অন্যতম দিশা হয়ে উঠতে চেয়েছিল। এই কারণেই কেশবচন্দ্রের 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' একাধারে 'হিন্দুধর্ম' এবং অন্যধারে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল।

তবে, পূর্বে দুটি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে ব্যক্তিতন্ত্র প্রাধান্য পেয়েছিল, ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিতন্ত্র খানিক হ্রাস পায়। সাধারণ সমাজের উদ্যোগে সিটি স্কুল ও স্থাপন হয়। ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী প্রগতির সূচনাও ত্বরান্বিত হয়। নারীরা সমান ভোটের অধিকার পান। ১৮৮০ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ১৮০১ শকের ১২ই মাঘ(জানুয়ারি, ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ) 'নব-বিধান' ঘোষণা করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও এই সময় থেকে 'নব-বিধান সমাজ' নামে পরিচিত হয়। 'নব-বিধান' শব্দটির অর্থ হল 'সর্ব ধর্ম সমন্বয়' বা 'ধর্মের সমন্বয় মার্গ'। কেশবচন্দ্র সেন মূলত সমস্ত ধর্মকেই সমগুরুত্ব দান করে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের উত্থানে তৎপর হন। রামমোহন রায়ও তাঁর ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডীডে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরকে সর্বজাতির মিলনক্ষেত্র রূপে বর্ণনা করে গেছেন। বলতে গেলে, কেশবচন্দ্র সেনও সেই আদর্শকে বহমান রাখার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিবেদন করেন। সর্বজাতির মিলনক্ষেত্র তো বটেই তাছাড়াও 'নব-বিধান' সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তাঁদের চিন্তাধারায় নির্দিষ্ট বলে স্থির হয়, যেমন—ঈশ্বর নিরাকার, মূর্তিপূজা অস্তিত্বহীন, ঈশ্বরকে মাতৃরূপে সাধনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সংযোজন হয়। যা হিন্দুধর্মের নিয়মতন্ত্র থেকে ভিন্নরূপে অবস্থান করে। ফলস্বরূপ হিন্দুধর্মের মত এবং ব্রাহ্মধর্মের মতের দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং সেই যুগে হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্ম দুটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি থেকে ব্রাহ্মধর্মের অগ্রসর আলোচনা করলেও মূলত যে বিষয়টি এখানে আলোকপাতের মূল লক্ষ্য তা হল ব্রাহ্মধর্ম ঠাকুরপরিবারের বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিতে কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা সম্পর্কে আলোচনা করা। খুব স্বাভাবিকভাবেই, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেখানে ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক, সেখানে ঠাকুরবাড়ির অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনেও ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব পড়বে একথা বলাবাহুল্য। স্রষ্টার জীবনাভিজ্ঞতা তথা সৃষ্টিতে তাই ধরাও পড়েছে। এক্ষেত্রে *গোরা* উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে হিন্দু-ব্রাহ্মধর্মের বিভেদের মধ্য দিয়েই সর্বজাতির মিলনক্ষেত্র ভারতবর্ষের রূপ রবীন্দ্রনাথ অনেকখানিই পরিকল্পিতভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন অনেকখানিই যেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষা কেশবচন্দ্র সেনের আদর্শের অংশ রূপে। এই অধ্যায়ে এই অংশটিই আলোচনা করা হল। কেশবচন্দ্র সেনের বিপ্লবী মতামত থেকে প্রাপ্ত গৃহীত পদক্ষেপের গুরুত্বই

উপন্যাসে যেন তুলে ধরা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে(মূলত পরেশবাবুর বাড়ির কথা উল্লেখ্য, যেহেতু তারা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী), অন্তঃপুরে স্ত্রী শিক্ষা দান, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান এমন মনে করে জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পুরুষ এবং নারী উভয়ের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বেঁধে দেওয়া(এখানে বরদাসুন্দরী হারানবাবুকে সুচরিতার বিবাহের বয়স সম্পর্কে বলে) প্রভৃতি কেশববাবুর ব্রাহ্মচিন্তায় *গোরা* উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে বলা যেতে পারে। সর্বপরী কেশববাবুর ভারতীয়তা বোধের বীজমন্ত্র ব্যাপক ভাবে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্ম-হিন্দু বিতর্কের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিকতাবাদের মূল মন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথ পাঠকের কাছে বার্তা হিসেবে দিতে চেয়েছেন। তবে, এই অধ্যায়ে হিন্দু-ব্রাহ্ম বিতর্কটি সমাজে কিরূপে অবস্থান করেছিল, একইসঙ্গে সমান্তরালে জাতপাতের সমস্যা অথবা হিন্দু-মুসলমান সমস্যাও কিভাবে ভেদাভেদের অবস্থানকে সক্রিয় করেছিল তা আলোচনা করা হল।

গোরা উপন্যাসে অনেকবেশি পরিকল্পিত ভাবেই যেন জাতীয়তাবাদের গুরুত্বকে প্রকাশ করতে হিন্দু-ব্রাহ্মধর্মের সমস্যাটিকে তুলে ধরা হয়েছে। *গোরা* উপন্যাসের প্রথম খসড়া লেখা শুরু হয়েছিল ১৯০৭ সালে এবং *গোরা* প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। অর্থাৎ বলার বিষয় এটিই, যে উপন্যাসের খসড়া তিনবছর পূর্বে প্রস্তুতি নিয়ে লিখতে শুরু করা হয়েছিল তা যথেষ্ট উদ্দেশ্যপ্রনোদিত। লক্ষ করার বিষয়, *গোরা* উপন্যাসটি যখন লিখিত হয় অথবা প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষ তখনও ইংরেজদের উপনিবেশ। ফলত জাতীয়তাবাদের আকাক্ষা তখনও ভারতবাসীর মন থেকে সরে যায়নি। ইতিহাসের পটভূমিতে তখন হিন্দু-ব্রাহ্ম দ্বন্দ্ব অপেক্ষাও আরো যে দ্বন্দ্বটি মানুষের মনে বীজ রোপণ করেছে তা হল হিন্দু-মুসলমান গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব সমস্যা। কারণ, ইতিমধ্যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রস্তাব আসে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে। স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রস্তুতি শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথও সেখানে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষরূপে না হলেও পরোক্ষে, কলমের দ্বারা প্রতিবাদ করে এই আন্দোলনে যোগদান

করেন। শুধুমাত্র তাই নয়, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদের ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তা রধ করার চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে হিন্দু-ব্রাহ্মধর্মের বিতর্কের মধ্য দিয়েও সেই জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাই করার চেষ্টা হয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে হিন্দু-ব্রাহ্ম দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গও উঠে আসবে, যেখানে কেশবচন্দ্র সেনের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের প্রায় সমান্তরালে জাতীয়তাবাদীর ব্যাপক চিন্তার মধ্য দিয়ে উপস্থিত। ১৯০৫ সালে 'আত্মশক্তি'র "নেশন কী" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন,

> *জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থঞ্জাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখন্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে।*[৮]

উক্ত উপলব্ধিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই যেন গোরা উপন্যাসে হিন্দু-ব্রাহ্মের বিবাদের স্বরূপটি স্পষ্ট হয়েছে। *গোরা* উপন্যাসের হিন্দু-ব্রাহ্ম দ্বন্দ্বের প্রকৃতি নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

গোরা উপন্যাসে মূলত দুটি পরিবারের মধ্য দিয়েই দুটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। *গোরা* উপন্যাসে নাম চরিত্র গোরা(গৌরমোহন) হিন্দুহিতৈষী সভার সভাপতি এবং তার বন্ধু বিনয়(বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়) সেই সভার সেক্রেটরি। গোরা প্রথমে কেশববাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেও ঘটনাক্রমে একজন ইংরেজ মিশনারি সংবাদপত্রে হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজকে আক্রমণ করে দেশের মানুষকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলে গোরা হিন্দুসমাজের প্রতি এই আঘাতে অসন্তুষ্ট হয়। যদিও সে হিন্দুধর্মের আচার পালনকে প্রকাশ্যে পূর্বে নিন্দা করলেও একজন ইংরেজের হিন্দুধর্মের প্রতি আঘাতে সে অপমানিত হয়। এরপরই সে *হিন্দুধর্ম ও সমাজের*

অনিন্দনীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ[৯] করতে করতে হিন্দুধর্মের সংস্কার যাপনে স্বাজাত্যাভিমানের কারণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সে গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক করতে থাকে, টিকি রাখে, খাওয়া-ছোঁওয়া সম্পর্কে বিচার করে চলতে থাকে। স্বাদেশিকতার কারণে হিন্দুধর্মকে অন্য সকল ধর্ম অপেক্ষা বড়ো বলে মনে করতে থাকে। ধর্মের প্রতি খানিক গোঁড়ামি যেন গোরাকে পেয়ে বসে। উপন্যাসে গোরার বাবা কৃষ্ণদয়ালবাবু---

> *একদিন পশ্চিমে থাকিতে ইনি পলটনের গোরাদের সঙ্গে মিশিয়া মদ-মাংস খাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছেন। তখন দেশের পূজারি পুরোহিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রেণীর লোকদিগকে গায়ে পড়িয়া অপমান করাকে পৌরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এখন না মানেন এমন জিনিস নাই।*[১০]

তিনি সংস্কারে বিশ্বাস করার ফলে গোরার সেই সংস্কারকে মেনে নেওয়ার তীব্রতা ক্রমাগত চরম থেকে চরমতর হয়। ভারতবর্ষকে দেশমাতৃকারূপে স্মরণ করে গোরা দেশীয় পূর্ব সংস্কারকেও সাবলীলতায় বরণ করে নেয়। দেশের প্রতিটি মানুষ তার কাছে হয়ে ওঠে ঈশ্বরসম। তাইতো, সূর্যগ্রহণের স্নান সে কলকাতার গঙ্গা নয়, দেশীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে ত্রিবেণীতে করতে চায়। সেখানে একত্রিত তীর্থযাত্রীর সঙ্গে গোরা নিজেকে মিলিয়ে দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করতে চায় এবং সেই উপলব্ধিকে হৃদয়ে আন্দোলিত করাতে চায়। ত্রিবেণীতে দেশের সকল মানুষকে আত্মীয় করে যেন বলতে চায়– *আমি তোমাদের, তোমরা আমার।*[১১] এর পরে পরেশবাবুর বাড়িতে গিয়ে ধর্মের গতিবিধি নিয়েই গোরার মতানৈক্য ঘটে। পরেশবাবুর পরিবার ছিল ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। সেই পরিবারে পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, আচার-আচরণ পালন প্রভৃতি নিয়মবিরুদ্ধ ওরফে সমাজবিরুদ্ধ। এই দুই মতানৈক্যের কারণের মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতকের সমাজে হিন্দু-ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব দেখানো হয়। দুটি ধর্মের মধ্যেই কিছু মতের অমিল গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে বিভেদের সৃষ্টি করে, যা স্বাদেশিকতার ঐক্যে বাধার সৃষ্টি করে। তবে,

শুধুমাত্র হিন্দু-ব্রাহ্ম সমস্যাকে ব্যাপকভাবে দেখানো হলেও সমাজের জাতিগোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে ধর্মভেদ-জাতিভেদে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে দেখানো হয়েছে; হিন্দু সমাজ মুসলমান সমাজকে কতটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে অথবা সমাজের শ্রেণি বিভাজনের তত্ত্বটি যে সক্রিয় ভাবেই বিরাজ করে সমাজকে অনগ্রসরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ইত্যাদি সমাজের স্বাভাবিক অথচ গভীর এক সমস্যাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অনৈক্যের বোধেই ছিল রবীন্দ্রনাথ তথা কেশবচন্দ্রের আপত্তি। ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে তারা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছোটো-ছোটো বিভেদের মধ্য দিয়েই সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন।

পাঠ্যাংশে গোরা বিনয়কে বলেছে, *শোনো বলি। অবিনাশ যে ব্রাহ্মদের নিন্দে করছিল, তাতে এই বোঝা যায় যে লোকটা বেশ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে।*[১২] শুধুমাত্র তাই নয়, এমন বেশ কিছু কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে, সেই সময়ের সমাজের রক্ষণশীল হিন্দু এবং ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ কেমন অবস্থায় পৌঁছেছিল, পাঠ্যাংশে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়-

> *ব্রাহ্মদের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, আচার বিচার কিছুই থাকবে না, কম্পাস ভাঙা কাণ্ডারীর মতো তোমার পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে...*[১৩]

এখানে গোরার তীব্র রক্ষণশীল গোঁড়ামি মানসিকটার দিকটি ফুটে উঠেছে। এখানে গোরা যে শুধুমাত্র কুসংস্কার মেনেছে তাই নয়, উপন্যাসের প্রথমাংশে সে জাতপাতের বিচারও করেছে। তাই সে আনন্দময়ীকে বলেছে, *তোমার ঐ খৃস্টান দাসী লছমিয়াটাকে না বিদায় করে দিলে তোমার ঘরে খাওয়া চলবে না।*[১৪] বলা যেতে পারে, এই গোঁড়ামিতে গোরার একটি স্বাজাত্যাভিমানের অহংকার ছিল। এমনকি গোরার সাজ পোশাকও হয়ে উঠেছে অনেক বেশি পরিকল্পনামাফিক, যা স্বদেশের প্রতি তার শ্রদ্ধাকেই উপস্থাপন করেছে, কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ ও একটা নূতন অদ্ভুত কটকি জুতো তার প্রমাণ। তাছাড়া, কৃষ্ণদয়ালবাবু, হরিমোহিনীদেবী, মহিম, অবিনাশদের মধ্য দিয়ে

হিন্দুধর্মের চিরাচরিত রক্ষণশীলতার দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে বিনয়, স্বাদেশিকতা এবং বন্ধুত্ব উভয় রক্ষার্থেই একটি দ্বিধান্বিত চরিত্রকে বহন করেছে। সমাজের হিন্দুত্ববাদের বিপরীতদিকে যে ব্রাহ্মধর্মকে হারানবাবু, বরদাসুন্দরীদেবী মেনে চলেছেন তার যতটা না সমাজের কল্যানার্থে, তারও বেশি যেন আধুনিক হবার অভিপ্রায়ে। তাই বরদাসুন্দরীদেবী অথবা হারানবাবু সচেতন হয়ে পড়েন যাতে তাদের রীতি কখনোই হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলে না যায় অথবা হরিমোহিনীও এই পৌত্তলিকতাবিরোধী কুসংস্কারবিরোধী অভ্যেসকে তার মানসিকতায় মেনে নিতে পারেননা। ঔপন্যাসিক বরদাসুন্দরী সম্পর্কে বলেছেন,

> *পরেশবাবুর স্ত্রীর নাম বরদাসুন্দরী।... পৃথিবীতে কোন জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোনটা অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকে।... মেয়েদের পায়ে মোজা দেওয়াকে এবং টুপি পড়িয়া বাহিরে যাওয়াকে তিনি এমনভাবে দেখেন যেন তাহাও ধর্মমতের একটা অঙ্গ। কোনো ব্রাহ্ম-পরিবারে আসন পাতিয়া খাইতে দেখিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আজকাল ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতার অভিমুখে পিছাইয়া পড়িতেছে।*[১৫]

জামাইষষ্ঠী ইত্যাদি আচার-কানুনকে বরদাসুন্দরী কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার অঙ্গ বলে জ্ঞান করে থাকেন। অতএব মনে করা যেতে পারে, এ সবই যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আধুনিক হয়ে ওঠার অনেকখানিই যেন প্রতিযোগিতামাত্র, সমাজ সংস্কারের অথবা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার প্রয়াসটুকু সেখানে উপলক্ষমাত্র। হিন্দু ধর্মকে অনেকখানি যেন বলপূর্বক অন্য একটি দ্বীপে পরিণত করার চেষ্টা। উপন্যাসের প্রথমাংশে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী মানুষ যেমন হিন্দুধর্মালম্বীদের থেকে পৃথক হবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, বিপরীতে হিন্দুরা ভুল করেও যেন ব্রাহ্মরীতিতে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে তার যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। যা পাঠ্যাংশে কথোপকথনের ভঙ্গিতে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। মহিমের কথায় যেমন প্রকাশ পাই সমাজের

রক্ষনশীলতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিনয়ের সঙ্গে কথোপকথন কালে সে বলে, *হিঁদুর ঘরের মেয়ে তো মেমসাহেব নয়--- সমাজকে তো উড়িয়ে দিলে চলে না।*[১৬] অন্যদিকে হরিমোহিনীর মানসিকতায় বোঝা যায় সমাজকে নিয়মের বেড়াজালে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখতে সে কতটা পরিশ্রমী। হরিমোহিনী পরেশচন্দ্রবাবুর বাড়ি অতিথি হিসেবে এলে, অতিথির সম্মানার্থে ছাতের উপরের নিভৃত ঘরে আচার রক্ষায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্যে পরেশবাবু স্থান দিলে এমন হিন্দুয়ানীর বাড়াবাড়ি দেখে বরদাসুন্দরীদেবী অসন্তুষ্ট হন। হরিমোহিনী তার সংস্কারে দৃঢ় থাকলে বরদাসদুন্দরী তাকে বলেন, *অত বামনাই করতে চান তো আমাদের ব্রাহ্ম-বাড়িতে এলেন কেন? আমাদের এখানে ও-সমস্ত জাতের বিচার করা চলবে না। আমি কোনোমতেই এতে প্রশ্রয় দেব না।*[১৭] হরিমোহিনীও আচারে বিঘ্ন ঘটতে দেওয়ার কোনো ভাবেই পক্ষপাতী নয়, ফলত তার সংস্কার বাঁচিয়ে রাখার সে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

> *কোনো অসুবিধায় হরিমোহিনীকে পরাস্ত করিতে পারিত না। তিনি কৃচ্ছ্রসাধনের চূড়ান্ত সীমায় উঠিবেন বলিয়াই যেন পণ করিয়াছিলেন। ...*
>
> *হরিমোহিনী যখন দেখিলেন জলের অসুবিধা হইতেছে তখন তিনি রন্ধন একেবারে ছাড়িয়াই দিলেন। তাঁহার ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া প্রসাদস্বরূপে দুধ এবং ফল খাইয়া কাটাইতে লাগিলেন।*[১৮]

তবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ভেদাভেদ ব্রাহ্ম-হিন্দু সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, একটি ব্যাপক ক্ষেত্রে এটি রূপ ধারণ করেছিল। কেশবচন্দ্র সেন অথবা রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের প্রচার করতে চেয়েছিলেন তা গঠন করা অনেকখানিই যেন ছিল অসম্ভব। এই চিন্তা অনেকখানিই ছিল আদর্শমূলক। বাস্তবজগতের সঙ্গে তার সংযোগ দূর সম্পর্কের। তা সত্তেও "গোরা" উপন্যাসে কেশবচন্দ্রের আদর্শকেই অনেকখানি যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যাংশেও এই সংক্রান্ত অনুষঙ্গও ব্যবহার করা হয়েছে, যা ব্রাহ্মধর্মের চিন্তা *গোরা"* উপন্যাসে কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা পরেশবাবুর বাড়ির বৈঠকখানার চিত্রকল্প থেকে বোঝা যায়,

> *দেয়ালে এক দিকে যিশুখৃস্টের একটি রঙ-করা ছবি এবং অন্য দিকে কেশববাবুর ফোটোগ্রাফ। ...কোণে একটি ছোটো আলমারি, তাহার থাকে থিয়োডোর পার্কারের বই সারি সারি সাজানো রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।*[১৯]

এই উক্তির মধ্য দিয়েই কেশবচন্দ্রের প্রভাবের উল্লেখ রয়েছে *গোরা* উপন্যাসে। পরেশবাবুর চরিত্রটিকে যেন কেশববাবুর মতের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে। তবে, শুধু ব্রাহ্ম-হিন্দু বিরোধের কথার উল্লেখ হয়নি, সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদের কথাও স্বল্প পরিসরে উঠে এসেছে। যাদের সঙ্গে মেলামেশা প্রায় একরকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে সমাজের উঁচু-নীচু জাতপাতের সমস্যাও যে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেকথাও রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তথা *গোরা* উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। পাঠ্যাংশ থেকে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্য এখানে নেওয়া হলঃ

মুসলমানের তৈরি পাঁউরুটি-বিস্কুট খাওয়াও অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছে কিন্তু আজ তাহার না খাইলে নয়।[২০]
(এখানে ব্রাহ্ম বাড়িতে চা খাওয়ার প্রসঙ্গে বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে)।

সমাজের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব উপন্যাসের ওপর পড়ে। তাই বলা যায়, জাত-পাতের সমস্যা যে বরাবর সংকটের ভূমিকা পালন করেছে, প্রথম দৃষ্টান্তটি তার প্রমাণ। হিন্দু ধর্মের বাইরে পা রাখা যেন সামাজিক একটি অন্যায়বোধের লক্ষণ হয়ে উঠেছে।যে অন্যায়বোধ বিনয়কে বেশ কয়েকবার আক্রান্তও করেছে।

> *এই দলের মধ্যে নন্দ গোরার সর্বপ্রধান ভক্ত ছিল। নন্দ ছুতারের ছেলে। বয়স বাইশ।...নন্দ একজন সামান্য চুতারের ছেলে--- তাহার অভাবে ক্ষণকালের জন্য সংসারে*

যেটুকু ফাঁক পড়িল তাহা অতি অল্প লোকেরই চোখে পড়িবে, কিন্তু আজ গোরার কাছে নন্দর মৃত্যু নিদারুণরূপে অসংগত ও অসম্ভব বলিয়া ঠেকিল।[২১]

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি সম্পর্কে বলা যায়, নন্দ যদি ছুতারের ছেলে না হয়েও শুধুমাত্র গোরার ভক্ত হত, তাহলেও নন্দর মৃত্যু গোরার কাছে 'নিদারুণরূপে অসংগত ও অসম্ভব' বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু, 'ছুতারের ছেলে' শব্দবন্ধটির ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়, কারণ-জাতপাতের এই শ্রেণিবিভাগ না থাকলে উক্ত শব্দবন্ধটি ব্যবহারের প্রয়োজন থাকত না।

অথবা, উপন্যাসে একজন বৃদ্ধ মুসলমানের প্রসঙ্গ এসেছে, যে তার মাথায় ঝাঁকাতে বিভিন্ন আহার্য সামগ্রী নিয়ে ইংরেজ প্রভুর পাকশালার দিকে যাচ্ছিল। পথে যেতে এক চেন-পরা বাবুর গাড়িতে ধাক্কা লেগে তার জিনিসপত্র মাটিতে পড়ে গেলে সেই বাবু-ই আবার তাকে 'ড্যাম শুয়ার' বলে তার মুখের ওপর ছড়ি দিয়ে আঘাত করলে কপাল থেকে রক্ত ঝরে পড়ে। এই ঘটনা দেখে গোরা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। মুসলমান মুটে গোরার মতো ভদ্রলোক পথিকের এমন আচরণে 'অত্যন্ত সংকুচিত' হয়। বলার বিষয়, প্রথম ঘটনাটি পরিচিত, অর্থাৎ, বৃদ্ধ মুটের চেন-পরা বাবুর দ্বারা অপমানিত হওয়া; দ্বিতীয় দৃশ্যটি তুলনায় কম পরিচিত, অর্থাৎ, গোরার বৃদ্ধকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা। তবে, একথাও বলা যায়, এই সাহায্য যত না বেশি সহমর্মী তারও বেশি গোরার প্রতিবাদের কারণ হয়ে উঠেছে। বরং ঘোষণা করে তা প্রতিবাদ হয়েছে বলা যায়, নাহলে 'মুসলমান' শব্দটির প্রসঙ্গ উল্লেখ না হলেও অসুবিধা হত না। প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

কিন্তু এক ভদ্রলোক যাহাকে অন্যায় অপমান করিয়াছে আর-এক ভদ্রলোক সেই অপমানিতের সঙ্গে নিজেকে সমান করিয়া ধর্মের ক্ষুব্ধ ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনিতে চেষ্টা করিতেছে এ কথা রাস্তার লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।[২২]

এরপরও জাতিভেদ-ধর্মভেদ নিয়ে গোরা, বিশেষ করে তার সঙ্গী রমাপতি আসন্ন বিপদের সামনেও কুসংস্কারকে লালন করতে চেষ্টা করে তার প্রমাণ মেলে যখন গোরা ভ্রমণে বেরিয়ে ভারতবর্ষের স্বরূপকে চিনতে চায়। গোরা এবং রমাপতি পথে চলতে চলতে নদীর চরে মুসলমান পাড়ায় উপস্থিত হয় কিন্তু সেখানে একটিই মাত্র হিন্দু পরিবার তারা খুঁজে পায়। সেখানে পৌঁছে তারা জল পান করতে গিয়েও দ্বিধান্বিত হয়ে জল পান থেকে বিরত থাকে। তারা জানতে পারে তাদের বাড়িতে আশ্রিত থাকে এক মুসলমান বালক। তারা তাদের আচার-নিয়মকে অবমাননা করবে না বলে ক্রোশ-দেড়েক দূরের নীল কুঠির কাছারির তহসিলদার ব্রাহ্মণ মাধব চাটুজ্জের বাড়ি আশ্রয় নিতে যান। বলা কর্তব্য, মধ্যাহ্নরৌদ্রে তপ্ত বালির ওপর চলতে চলতে যদিও গোরা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। তবুও, একথাও মানতে হবে, দারুণ জল-পিপাসাতেও হিন্দু নাপিতের বাড়ি তারা জলস্পর্শ করেনি, শুধুমাত্র মুসলমান সন্তান নাপিতের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে বলে। লক্ষ্যনীয়, চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি হৃদয়েও এই গোঁড়ামি কতখানি অংশ জুড়ে ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যেখানে রক্ষণশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। বলা যায়, এই রক্ষণশীলতার বাড়াবাড়ি যেমন গোরা ও তার সঙ্গী ঘরের বাইরেও করেছে, তেমনি এই গোঁড়া হিন্দুয়ানী হরিমোহিনীও পরেশবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করে অন্দরমহলেও বজায় রাখতে চেয়েছে। হরিমোহিনীর রান্নার জল তুলে দেওয়ার জন্য একজন গোয়ালা বেহারা ছিল। তাকে সময়মতো পাওয়া না গেলে হরিমোহিনী অসুবিধায় পড়তেন, কারণ রামদীন বলে অন্য একজন থাকলেও তিনি ভিন্ন জাতের কারো হাতে জলস্পর্শ করবেন না বলে তার কাজে বিঘ্ন ঘটত, অথচ তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল থাকতেন। বলাবাহুল্য রামদীন জাতে 'দোসাদ' ছিলেন। শুধুমাত্র নিজের সংস্কার নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেননি, সুচরিতাকেও তিনি জাত-পাত বাছ-বিচার সম্পর্কে সচেতন হতে বলেছেন। পাঠ্যাংশেই হরিমোহিনী সুচরিতাকে বলেছেন, *একটা কথা বলি বাছা, যা*

কর তা কর, তোমাদের ঐ বেহারাটার হাতে জল খেয়ো না।[২৩] এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাঠ্যাংশের শেষে একটি সমাধানের পথ বের করেছে ঠিকই, কিন্তু সমাজের মনোভাব এই সকল বিচার-বোধ থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

তবে, শুধুমাত্র জাতপাতের সমস্যা নিয়ে যে ব্যক্তিমানসেই প্রভাব পড়েছে তা নয়। অন্দরমহলে-বাহিরমহলে যেমন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনই এই সমস্যা ব্যক্তি-সিদ্ধান্তের সংশয়ের কারণও হয়ে উঠেছে। তাই বিনয় পরেশবাবুর বাড়িতে বেড়াতে গেলে বরদাসুন্দরী যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে তাকে ব্রাহ্মসমাজে দেখেছে কিনা, বিনয় তখন দ্বিধান্বিত সংশয় মিশ্রিত এক অপরাধ বোধে ভুগতে থাকে। প্রত্যুত্তরে সে অনাবশ্যক 'লজ্জা প্রকাশ' করে বলে, *হ্যাঁ, আমি কেশববাবুর বক্তৃতা শুনতে মাঝে মাঝে যাই।*[২৪] এখানে স্পষ্ট হয়, ব্রাহ্মসমাজ-হিন্দু সমাজের দ্বন্দ্বের কথা। কেউ হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস রাখলে তার কেশববাবুর বক্তৃতা শোনা যেন অসম্ভব। অন্তত বিনয়ের স্বভাবে সেই বক্তব্যই উঠে আসে। সমাজের নিজস্ব নিয়মে যে আক্রান্ত ব্যক্তিমানস আক্রান্ত তা বোঝা যায়। অথবা এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে প্রবেশ এও যে কত বড়ো শঙ্কা তা গোরার ভাবনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

> *পরেশবাবুর পরিবারের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে, গোরার অন্তঃকরণ একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে মনের মধ্যে প্রকান্ড একটা বিদ্রোহ বহন করিয়া পরেশবাবুর বাড়ির দিকে ছুটিল।ইচ্ছা ছিল সেখানে এমন-সকল কথা উত্থাপন করিবে যাহা শুনিয়া এই ব্রাহ্ম-পরিবারের হাড়ে জ্বালা ধরিবে এবং বিনয়েরও আরাম বোধ হইবে না।*
>
> *পরেশবাবুর বাসায় গিয়া শুনিল তাঁহারা কেহই বাড়িতে নাই, সকলেই উপাসনামন্দিরে গিয়াছেন। মুহূর্তকালের জন্য সংশয় হইল বিনয় হইতো যায় নাই--- সে হয়তো এইক্ষণেই গোরার বাড়িতে গেছে।*[২৫]

এখানে ব্যাপক এক আশঙ্কা বোধ গোরার অন্তরে ভীতি সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। এতো গেল প্রাথমিকভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের ভীতি, এমনই ভাবে হারানবাবুর মতো উৎসাহী ব্রাহ্মের মধ্যেও সমাজের নিয়মের কথা উল্লেখ হয়েছে, হারানবাবুর বক্তব্যে। হারানবাবু বিনয় ললিতার সম্পর্ক নিয়ে সুচরিতাকে বলেছেন,

> *ব্রাহ্মসমাজের কাছে যে আমাদের জবাবদিহি আছে। সমাজের লোকের কাছে তুমিই বা কী বলবে আমিই বা কী বলব?*[১৬]

এই সকল দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে সমাজের গোঁড়ামি ফুটে ওঠে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সাম্প্রদায়িকতার কণা ছড়িয়ে রয়েছে তার কথায় বলার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *গোরা* উপন্যাসে। সমাজের অভ্যন্তরে ধর্মকে কেন্দ্র করে বিবাদের যে সূচনা তাই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম অংশে এই গোঁড়ামিকে রক্ষা করতে চেয়েছে উপন্যাসের নায়ক গৌরমোহন। এই বিভেদ শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে বিবাদ ঘটিয়েছে তা নয়, বহির্বিশ্বের কাছে এই দেশকে আরো দূর্বল করেছে এমন বার্তায় পরিস্ফুট হয়।

তথ্যসূত্র

১। ক্ষিতিমোহন সেন, *হিন্দুধর্ম,* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃ-১০।

২। ড. বারিদবরণ ঘোষ, *ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা এজেন্সিস লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ-৬।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* সম্পাঃ বারিদবরন ঘোষ, কলকাতাঃ নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, পৃ-৬৮।

৪। ড. বারিদবরণ ঘোষ, *ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা এজেন্সিস লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ-৭।

৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* সম্পাঃ বারিদবরন ঘোষ, কলকাতাঃ নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, পৃ-৬৮-৬৯।

৬। তদেব পৃ-৭১।

৭। ড. বারিদবরণ ঘোষ, *ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা এজেন্সিস লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ-১৫।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আত্মশক্তি", *রবীন্দ্র-রচনাবলী(দ্বিতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, মাঘ ১৮২০, পৃ-৬২০।

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গোরা", *রবীন্দ্র-রচনাবলী(তৃতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪২১, পৃ-৩৯৫।

১০। তদেব পৃ-৩৯৩।

১১। তদেব পৃ-৩৯৮।

১২। তদেব পৃ-৩৮৩।

১৩। তদেব পৃ-৩৮৪।

১৪। তদেব পৃ-৩৮৭।

১৫। তদেব পৃ-৪০৩-৪০৪।

১৬। তদেব পৃ-৪২০।

১৭। তদেব পৃ-৫২৩।

১৮। তদেব পৃ-৫২৩।

১৯। তদেব পৃ-৪০০।

২০। তদেব পৃ-৪০৮।

২১। তদেব পৃ-৪২৩।

২২। তদেব পৃ-৪৩৯।

২৩। তদেব পৃ-৫৪৪।

২৪। তদেব পৃ-৪০৪।

২৫। তদেব পৃ-৪২৫।

২৬। তদেব পৃ-৫৩২।

তৃতীয় অধ্যায়

গোরা উপন্যাসে নিবেদিতা এবং বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

গোরা উপন্যাস রচনার পটভূমিতে ভগিনী নিবেদিতার এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ রয়েছে, এমন মত বহুচর্চিত এবং আলোচিত একটি বিষয়। এই বিষয়ের ওপর অনুমান এবং তথ্যাদি ভিত্তিতে গবেষণা আগেও হয়েছে। এমনকি অনেকে মনে করেন, গোরা'র ভারতবর্ষের আড়ালে রয়েছে নিবেদিতার ভারতবর্ষের ভাবনা। অনেকে মনে করেন, গোরা'র ভারতবর্ষ আসলে নিবেদিতা এবং বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ ভাবনার মিলিত রূপ। আবার অনেকে মনে করেন, গোরা'র ভারতবর্ষ ভাবনার আড়ালে রয়েছে শুধুমাত্র বিবেকানন্দেরই ভারতবর্ষ ভাবনা। মূলত *গোরা* উপন্যাসের পটভূমিতে কার প্রভাব বেশি রয়েছে তা যেমন এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে, তেমনি জাতীয়তাবাদের চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ গোরা'র মতো নায়ক বিচারে কেমন চরিত্রকে সময়োপযোগী মনে করে পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। *গোরা* আলোচনা করতে গেলে খুব স্বাভাবিক ভাবে বিবেকানন্দ-নিবেদিতার প্রসঙ্গ চলেই আসবে। মনে রাখা আবশ্যক, *গোরা* উপন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত-ভাবনার দলিল হিসেবে পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। *গোরা* রচনা অনেক বেশি উদ্দেশ্যমূলক এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনামূলক, যেকারণে *গোরা* রচনার সময়কালও(১৯০৭-১৯১০) ছিল দীর্ঘ, প্রায় তিনবছর। ঔপন্যাসিক এখানে অনেক বেশি যত্নশীল এবং নিষ্ঠাবান। অতএব, এই উদ্দেশ্যের কথা আলোচিত না হলে *গোরা* আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

গোরা উপন্যাসে গোরাকে রবীন্দ্রনাথ আইরিশ সন্তান হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, এই বিচারে অনেকে মনে করেন গোরা'র সৃষ্টিতে নিবেদিতার প্রভাব রয়েছে। শুধুমাত্র আইরিশ সন্তান

হওয়ার কারণেই নয়, তার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, নিবেদিতার ভারতবর্ষের প্রতি আত্মত্যাগ ও দৃঢ় মানসিকতা এবং তাঁর নিজস্ব যোদ্ধৃত্ব স্বভাব। গোরার স্বভাবে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকেই বর্তমান থাকতে দেখা যায়। এখানে ভগিনী নিবেদিতার স্বভাবের বর্ণনা কিছু ঘটনার দ্বারা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভগিনি নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম আলাপের ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

> *ভগিনি নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনারি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।*
>
> *সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি, এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।*[১]

অতএব, এই অংশের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, স্বাজাত্যাভিমানের প্রতি নিবেদিতা কতটা সৎ ছিলেন। *গোরা* উপন্যাসে গোরারও স্বদেশের প্রতি অহংকারের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও, নিবেদিতার ভারতবর্ষের ভাবনার সঙ্গে গোরার ভারতবর্ষের ভাবনাকে যে কারণে তুলনা করা হয়, তার আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল নিবেদিতার মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস, যা গোরার চরিত্রে উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পরিচয়* গ্রন্থের 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধ থেকে আরও একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হল।

সেইসঙ্গে তাঁহার আর-একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের ওপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন--- মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল।[২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশের মানুষের প্রতি আন্তরিক প্রীতির কারণে যেমন নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' বলে উল্লেখ করেছেন, তেমনি আবার বলেছেন নিবেদিতার মধ্যে এক প্রবল শক্তি, এক সর্বতোমুখী প্রতিভা রয়েছে। নিবেদিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এমন মন্তব্যে *গোরা* উপন্যাসের গোরাকে অনেকে নিবেদিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। একথা অনেকে মনে করেন, গোরার তেজস্বী রূপে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার মূর্তিকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। আরো একটি যে কারণে গোরার ভাবমূর্তিকে নিবেদিতার সঙ্গে অনুমান করা হয়, তা হল *গোরা*-র ইংরেজি অনুবাদক উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সনকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক পত্র, যেখানে বলা হয়েছে,

You ask me what connection had the writing of Gora with Sister Nivedita, she was our guest in Shilida and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of Gora. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by the disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won't find it in Gora as it stands now--- but I introduced it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind.[৩]

তবে, এই যুক্তি থেকে গোরার চরিত্রে যে নিবেদিতার ভাবমূর্তিই প্রগাঢ় ভাবে উপস্থিত হয়েছে, সেকথা স্পষ্ট নয়। বরং এই যুক্তিকে গ্রহণ করলে আরো কিছু প্রশ্ন উঠে আসে, যেমন- যদি গোরার ভূমিকায় নিবেদিতা অংশগ্রহণ করেন, তবে বিবেকানন্দের ভূমিকায় কাকে অনুমান করা

যাবে। সেক্ষেত্রে পরেশবাবুর নাম উল্লেখ করা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও দ্বিধা থেকে যায়। পরেশবাবু চরিত্রটি একটি আদর্শ চরিত্র হিসাবে উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যাকে শুধুমাত্র ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ নয়, বিশ্বমানবতাবাদের আদর্শের প্রতিনিধি রূপে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। বিবেকানন্দর স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে পরেশবাবুর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া পাঠকের সমস্যা হতে পারে। অতএব, সেইদিক থেকে বিবেচনা করলে নিবেদিতাকে গোরা'র ভূমিকায় অনুমান করা অসুবিধাজনক। তাছাড়া, আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার, উপন্যাসে গোরা এবং সুচরিতার সম্পর্ক গুরু-শিষ্যা, অন্যদিকে বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতার সম্পর্কও গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে,

> *Nevertheless the characteristic behaviour of Swamiji towards Sister Nivedita and their dramatic dialogues reveal the true spirit of Guru and disciple. It is a play (Lila)--- etarnal play, between the two. The reader should take up these happenings as subjects of deep meditation, not as stories or incidents.*[৪]

অতএব, সেক্ষেত্রে গোরার ভূমিকায় নিবেদিতাকে কল্পনা করলে শিষ্যার ভূমিকায় কোন চরিত্র কল্পনা করা যেতে পারে। *জগদীশ ভট্টাচার্যের অগ্রন্থিত গদ্যে* প্রাবন্ধিক *এমন কথা বলেছেন।*

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যদিও গোরার চরিত্রে দুইজন অর্থাৎ বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতা উভয়েরই মিশ্রিত অস্তিত্বের কথা বলেছেন।

> *স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা সমন্বিত হইয়াছিল... তাঁহার আদর্শায়িত হিন্দুসমাজের সাধ্য ছিল না যে আইরিশ মহিলা মিস মার্গারেট নোবলকে 'ভগিনী নিবেদিতা' আখ্যা দিয়া হিন্দুসমাজের কোনো পর্যায়ে কণামাত্র স্থান করিয়া দিতে পারে। ...গোরার*

চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাই বলিলে আশা করি কেহ আঘাত পাইবেন না।[৫]

কিন্তু, এতেও যে সকল দ্বিধা সম্পূর্ণ ভাবে স্বচ্ছ হয়, এমন বলা যায় না।

প্রাবন্ধিক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় গোরা'র ভারতবর্ষের আড়ালে বিবেকানন্দের ভাবমূর্তিকেই খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রাথমিকভাবে, বিবেকানন্দের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের মূর্তিকে কল্পনায় আনা প্রয়োজন। বিবেকানন্দের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য নিবেদিতার জীবনীর সরল বক্তব্যে বলার চেষ্টা করছেন---

...পুরো মাপের গেরুয়া আলাখাল্লা আর খুনখারাপি রঙের কোমরবন্ধ-পরা স্বামী বিবেকানন্দ---বসলেন ঠিক মার্গারেটের মুখোমুখি। দীর্ঘ সুগঠিত শরীর, প্রসন্ন গাম্ভীর্যের একটা হিল্লোল তাঁকে ঘিরে...ও লক্ষ্য করে। প্রশান্ত আত্মসমাহিত পুরুষ,...শোনা গেল সন্ন্যাসীর সুরেলা কণ্ঠে প্রার্থনার মন্ত্র---'শিব শিব নমঃ শিবায়।[৬]

উক্ত বক্তব্যটিতে বিবেকানন্দেরই রূপ বর্ণিত হয়েছে, তবুও বিবেকানন্দের রূপে গোরার রূপের বর্ণনা করলে পাঠকের বিশেষ অসুবিধা হয় না। গোরা'র বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, *তাঁহাকে তাহার কালেজের পন্ডিত মহাশয় রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন।*[৭] অথবা হিন্দুধর্মে তীব্র বিশ্বাসী হরিমোহিনী যখন গোরাকে দেখেন, তখন গোরার রূপে আশ্চর্য হয়ে হিন্দুধর্মের দেবতার অনুষঙ্গের কথা বলেন, এই তো ব্রাহ্মণ বটে! যেন একেবারে হোমের আগুন। যেন শুভ্রকায় মহাদেব।

উপন্যাসে গোরার বর্ণনায় বেশ কয়েকবার শিবের অনুষঙ্গ এসেছে। নরেনের প্রাথমিক জীবনেও, বিশেষত বলা যায় নরেন্দ্রনাথের ডাকনাম 'বীরেশ্বর' বা 'বিলে' হওয়ার পেছনেও শিবের ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়। বিবেকানন্দ নিজেও প্রকৃতির রূদ্র রূপে বিশ্বাসী ছিলেন। তা

তাঁর 'Kali the Mother' কবিতায় বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে গোরার মায়ের প্রতি ভক্তির দিকটি উপন্যাসে বেশ অনেকখানি অংশ জুড়েই বিক্ষিপ্ত ভাবে বিস্তৃত হয়েছে। বিশেষত দেখা যায় যখন সে জেল থেকে মুক্তি পায়। যখন বেহারা এসে তাকে খবর দেয় যে আনন্দময়ী গোরাকে ডাকছেন, গোরা তখন নিজের ভেতরেই অনন্য এক অনুভূতির সন্ধান পায়।

> *বেহারা আসিয়া খবর দিল মা ডাকিতেছেন। গোরা যেন হঠাত চমকিয়া উঠিল। সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল 'মা ডাকিতেছেন!' এই খবরটাকে সে যেন একটা নূতন অর্থ দিয়া শুনিল। সে কহিল, 'আর যাই হউক, আমার মা আছেন। এবং তিনিই আমাকে ডাকিতেছেন। তিনিই আমাকে সকলের সঙ্গে মিলাইয়া দিবেন, কাহারও সঙ্গে তিনি কোনো বিচ্ছেদ রাখিবেন না।... গোরা সেই শীতমধ্যাহ্নের আকাশের দিকে বাহিরে চাহিয়া দেখিল। এক দিকে বিনয় ও আর-এক দিকে অবিনাশের তরফ হইতে যে বিরোধের সুর উঠিয়াছিল তাহা যৎসামান্য হইয়া কাটিয়া গেল। এই মধ্যাহ্নসূর্যের আলোকে ভারতবর্ষ যেন তাহার বাহু উদঘাটিত করিয়া দিল। তাহার আসমুদ্রবিস্তৃত নদীপর্বত লোকালয় গোরার চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল, অনন্তের দিক হইতে একটি মুক্ত নির্মল আলোক আসিয়া এই ভারতবর্ষের সর্বত্র যেন জ্যোতির্ময় করিয়া দেখাইল। ...ভারতবর্ষের যে মহিমা সে ধ্যানে দেখিয়াছে তাহাকে নিজের চক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া তাহার কিছুমাত্র ক্ষোভ রহিল না। সে মনে মনে বার বার করিয়া বলিল, 'মা আমাকে ডাকিতেছেন--- চলিলাম যেখানে অন্নপূর্ণা, যেখানে জগদ্ধাত্রী বসিয়া আছেন সেই সুদূরকালেই অথচ এই নিমেষেই, সেই মৃত্যুর পরপ্রান্তেই অথচ এই জীবনের মধ্যেই, সেই-যে মহামহিমান্বিত ভবিষ্যৎ আজ আমার এই দীনহীন বর্তমানকে সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে---আমি চলিলাম সেইখানেই--- সেই অতিদূরে সেই অতিনিকটে মা আমাকে ডাকিতেছেন।'*[৮]

এখানে গোরা যেমন তার মা আনন্দময়ীকে জীবনের এক এবং একমাত্র সত্য করে উপলব্ধ করে, তেমনি এই মায়ের রূপে মিলে যায় তা স্বদেশভাবনা, তাঁর দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়। শুধুমাত্র তাই নয়, তাঁর কাছে মা রূপে কল্পনায় প্রকাশ পায় জগদ্ধাত্রীর জ্যোতির্ময়ী রূপ।

বিবেকানন্দ ব্যক্তি জীবনে শাক্ত বিশ্বাসী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বহু আলোচিত কবিতাটির(Kali The Mother) উল্লেখ থাকল।

The stars are blotted out,

The clouds are covering clouds,

It is darkness vibrant, sonant,

In the roaring, whirling wind,

Are the souls of a millions lunatics---

Just loosed from the Prison-house,---

Wrenching trees by the roots,

Sweeping all from the path.

The sea has joined the fray

And swirls up mountain-waves,

To reach the pitchy sky.

The flash of lurid light

Reveals on every side

A thousand, thousand shades

Of Death, begrimed and black.

Scattering plagues and sorrows,

Dancing mad with joy,

Come, Mother, come!

For Terror is Thy name,

Death is in Thy breath.

And every shaking step

Destroys a world for e'er.

Thou 'Time' the All-Destroyer!

Come, O Mother, come.

Who dares misery love,

Dance in Destruction's dance,

And hug the form of Death---

To him the Mother comes.[৯]

এতো গেল গোরার কালেজের পন্ডিত অথবা হরিমোহিনীর কথা গোরা সম্পর্কে। ঔপন্যাসিক গোরা সম্পর্কে নিজেই বলেছেন,

তাহার গায়ের রঙটা কিছু উগ্র রকমের সাদা--- হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছ ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মত বড়---গলার আওয়াজ এমনি মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে 'কে রে' বলিয়া

চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড় এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত; চোয়াল ও চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মত; চোখের ওপর ভ্রুরেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গেছে। ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোট ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতি দূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া আছে অথচ এক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মত আঘাত করিতে পারে। গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।[১০]

এছাড়া, গোরার প্রচন্ড গাম্ভীর্য গলার আওয়াজ প্রসঙ্গেও ঔপন্যাসিক বলেছেন,

গোরার চরিত্রের সঙ্গে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে, অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে এবং মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরের মর্মভেদী প্রবলতার সঙ্গে তাহার কথাগুলি মিলিত হইয়া একতা সজীব ও সত্য আকার ধারণ করিয়াছিল।[১১]

কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে গোরার এই রূপ পন্ডিতমশায় বা হরিমোহিনীর চোখেই ধরা পড়েছে, তা নয়। গোরা যখন চর-ঘোষপুরে যায়, সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট অবধি তাকে দেখে বিস্মিত হন। তার পোশাকি সাজে যে স্বদেশীয়ানা রয়েছে, তা সাহেবকে অবাক করেছিল।

এমন ছয় ফুটের চেয়ে লম্বা, হাড়-মোটা, মজবুত মানুষ তিনি বাঙ্গলাদেশে পূর্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।ইহার দেহের বর্ণও সাধারণ বাঙালির মতো নহে। গায়ে একখানা খাকি রঙের পাঞ্জাবি জামা, ধুতি মোটা ও মলিন, হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি, চাদরখানাকে মাথায় পাগড়ির মতো বাঁধিয়াছে।[১২]

এই সকল চিত্রকল্পের মধ্যে জগদীশ ভট্টাচার্য 'ভারত পুরুষ' বিবেকানন্দর ভাবমূর্তিকেই খুঁজে পেয়েছেন। এতো গেল বাহ্যিক রূপের কথা, অন্তরের রাজকীয়তা এবং দৈনন্দিন যাপনের কৃচ্ছসাধনার কথা--- যা একাধারে যেমন গোরার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, তেমনি

তা বিবেকানন্দের সঙ্গেও মেলানো যায়। এছাড়াও একটি বৃহৎ ক্ষেত্রের কথা রবীন্দ্রনাথ *গোরা* উপন্যাসে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যা হল গোরার স্বদেশপ্রেম। গোরার স্বদেশপ্রেম পাঠকের কাছে তুলে ধরতে গিয়ে *গোরা* যথার্থ উপন্যাস অপেক্ষাও বলা যায় *গোরা* স্বতন্ত্র ভাবে একটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট একটি আদর্শায়িত ভাবনা হয়ে উঠেছে।

এবার আলোচনা করা যাক, গোরার স্বদেশপ্রেমের কথা। একজন ইংরেজ মিশনারির সংবাদপত্রে হিন্দুশাস্ত্রকে নিন্দা গোরার কাছে অপমানের বিষয় হয়ে উঠেছিল। একজন ইংরেজের কাছ থেকে হিন্দুজাতির(এখানে জাতীয়তাবাদেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়) অপমান গোরার স্বাজাত্যাভিমানে আঘাত করেছিল। তারপই সে যুক্তি ও শাস্ত্র পড়ার চেষ্টা করে প্রমাণ সংগ্রহ করা শুরু করে। ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের আচারের প্রতি সে আকৃষ্ট হয় এবং হিন্দুধর্মের প্রায় একপ্রকার প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করে। গোরা মনস্থির করে সে ত্রিবেণীতে সূর্যগ্রহণের স্নান করবে। শুধুমাত্র, হিন্দুধর্মের আচার পালন করবে এজন্য নয়, সে চায় সেখানে যে তীর্থযাত্রী একত্র হবে, সেই জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে এক করে মিলিয়ে দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করবে। তার ক্ষণিক অবকাশে তার সংকোচ, সংস্কার সবলে পরিত্যাগ করে সবলে বলবে, "*আমি তোমাদের, তোমরা আমার*"[১৩]। অর্থাৎ সমগ্র মিলিয়ে এখানেই সে এক জাতি-গোষ্ঠীর মিলনের স্বপ্ন দেখে। এখানেই তার অন্তরে আদর্শ ভারতভাবনার ধারণার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

গোরার কাছে ভারতবর্ষ বরাবরই খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণীয়। তাই বিনয়কে গোরা বলে, *জাহাজের কাপ্তেন যখন সমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন যেমন আহারে বিহারে কাজে বিশ্রামে সমুদ্রপারের বন্দরটিকে সে মনের মধ্যে রেখে দেয় আমার ভারতবর্ষকে আমি তেমনি করে মনে রেখেছি।*[১৪] প্রত্যুত্তরে, বিনয় যখন গোরাকে জিজ্ঞাসা করে, গোরার কাছে ভারতবর্ষ কোন অবস্থানে রয়েছে? গোরা বুকে হাত দিয়ে

তাকে বলে, *আমার এইখানকার কম্পাসটা দিনরাত যেখানে কাঁটা ফিরিয়ে আছে সেইখানে, তোমার মার্শম্যান সাহেবের হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার মধ্যে নয়।*[১৫] কাজ বলতেও গোরা আত্মকেন্দ্রিক কাজ বোঝেনি, কাজের প্রসঙ্গ আসলেই সে সমষ্টির বিচারে স্বদেশের প্রতি কাজকেই বুঝেছে। বিনয়কে কথা প্রসঙ্গে বলেছে, *এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা-কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া। দেশের সম্বন্ধে লজ্জা করে করে আমরা নিজের মনকে দাসত্বের বিষে দুর্বল করে ফেলেছি।*[১৬] যে বিষয়টি বলার, এখানে গোরার চরিত্রটিকে স্বদেশের প্রতি নিষ্ঠাবান আদর্শ একটি পুরুষ হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। গোরা চরিত্রটি বাস্তবতার সঙ্গে যতটা না মেলে, তারও বেশি দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে সে, দেশের এক শুভাকাঙ্খী হিসেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয়, গোরাকে রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-পুরুষ' করে গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেশের প্রতিটি অনুভূতি গোরার নিজস্ব হয়ে উঠতে দেখা যায় উপন্যাসে।

গোরা আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিবেকানন্দকে জানার চেষ্টা করলে গোরা চরিত্র বুঝতে এবং রবীন্দ্রনাথের *গোরা* রচনার কারণ বুঝতে কিছুটা সুবিধা হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ(১৮৬১-১৯৪১) এবং বিবেকানন্দের(১৮৬৩-১৯০২) বয়সের পার্থক্য বেশি নয়। উপরন্তু, তাঁদের জন্মস্থানের ভৌগোলিক দূরত্বও বেশি নয়। একের সঙ্গে অপরের পরিচয় থাকবে এতে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানও বিবেকানন্দ গাইতেন। তোমারেই করিয়াছি জীবনেরও ধ্রুবতারা, সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে প্রভৃতি গান বিবেকানন্দের প্রিয় গানের তালিকাভুক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন, বিবেকানন্দের বাণী কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে যুবক সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধন করবে। রবীন্দ্রনাথের কাছেও বিবেকানন্দ ছিলেন একজন আদর্শ পুরুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাবনাতেও

বিবেকানন্দের স্থান ছিল মহানমানবের রূপে। পরাধীন ভারতের প্রতি দুজনেরই সুগভীর সুচিন্তিত ভাবনা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে বিবেকানন্দের স্বদেশ ভাবনার কথারই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

> *অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।*[৭]

অর্থাৎ, বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের চেতনাতেও আদর্শ পুরুষের একজন উদাহরণ হয়ে উঠছেন বিবেকানন্দ। গোরাকেও ভারতবর্ষের প্রতি চিন্তাশীল এক আদর্শ পুরুষ হিসেবেই কল্পনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিবেকানন্দর লেখাতেও এই ভারতবর্ষ ভাবনার অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ বলতে বুঝেছিলেন সমস্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একখন্ড ভূখন্ডকে। এই ভারতবর্ষের ধারণাই পাওয়া যায়, কবি বিবেকানন্দের 'ইহাই ভারতবর্ষ...', 'যদি ভারতবর্ষ...', 'নূতন ভারত বেরুক...' কবিতাতে। 'নূতন ভারত বেরুক...' কবিতায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের জাগরণ প্রার্থনা করছেন। তিনি বলেছেন,

নূতন ভারত বেরুক...

বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে,

জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে,

ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে,

কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে,

...

এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে,

আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোকে ধরবে না এদের তেজ,

এরা রক্তবীজের প্রান।[১৮]

এই ভাবনাতেই বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ ভাবনা পূর্ণ হয়েছে। বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ ভাবনা সম্পর্কে তাঁর *বর্তমান ভারত* গ্রন্থের 'স্বদেশমন্ত্র'এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে,

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা---এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না---তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না---তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না---তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের---নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না---তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না---তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না---নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল---আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল---মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল--- ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই--- ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ

আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।[১৯]

বিবেকানন্দের এই বক্তব্যের মধ্যে সামগ্রিক ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনের চেষ্টা উঠে আসে। এবারে গোরার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেখলে এর লক্ষণগুলি বর্তমান। *গোরা* থেকে উদ্ধৃতি ঋণ নিয়ে গোরা এবং বিনয়ের কথোপকথন থেকে উল্লেখ করা যায়,

ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি সে তো সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়--- সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে, ফুল দিয়ে পুজো নয়; সেখানে প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে পুজো করতে হবে--- আমার কাছে সেইটেই সব চেয়ে বড়ো আনন্দ মনে হচ্ছে--- সেখানে সুখ দিয়ে ভোলাবার কিছু নেই--- সেখানে নিজের জোরে সম্পূর্ণ জাগতে হবে, সম্পূর্ণ দিতে হবে--- মাধুর্য নয়, এ একটা দুর্জয় দুঃসহ আবির্ভাব--- এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ংকর... এই হচ্ছে জীবনের তান্ডবনৃত্য।[২০]

বিবেকানন্দের কথা এবং গোরার কথা কোথাও যেন এক হয়ে মিলে যেতে চায়। যেখানে সম্পুর্ণ হয়ে ভারতবর্ষের জাগরণের কথা গোরাও উচ্চারণ করেছে। গোরার সদর্পপূর্ণ সাহসও যেন বিবেকানন্দের স্বভাবের সঙ্গে মেলে। বিবেকানন্দের কর্মোদ্যমের ক্ষমতা, বলা ভালো, কাজ করবার ইচ্ছাশক্তি একেও যেন গোরার স্বভাবে অনায়াসে মিলিয়ে দেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের কিছু চিঠিপত্রের উল্লেখ করা হল---

এবার 'শরীরং বা পাতয়ামি, মন্ত্রং বা সাধয়ামি' প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।[২১]

অথবা,

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না--- আত্মানং সততং রক্ষেৎ। Lord have mercy (ঈশ্বর করুণা করুন) ঠিক বটে, কিন্তু He helps him who helps himself (যে উদ্যমী, ভগবান তাহারই সহায় হন)।[২২]

শ্রী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়, তিনি বারবার সাহসী হওয়ার কথা বলছেন। গোরার উক্তিতে, চরিত্রেও এই সাহসিকতার কথা শোনা যায়, ক্ষেত্রবিশেষে তার পরিচয়ও পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়।

> *...আমার সহিত তোমাদের আর দেখা না হইতে পারে---নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও---প্রাণের ভয় পর্যন্ত রাখিও না। ...নিজে মানুষ হও, আর রাম প্রভৃতি যাহারা সাক্ষাৎ তোমার তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদিগকে সাহসী, নীতিপরায়ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। হে বৎসগণ, তোমাদের জন্য নীতিপরায়ণতা ও সাহস ব্যতীত আর কোন ধর্ম নাই...।*[২৩]

২৩ নং পত্রেও বলছেন,

> *সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ। নীতিপরায়ণ, সাহসী ও সহানুভূতিশীল হইবার চেষ্টা কর।*[২৪]

আরো একটি যে দিকের উল্লেখ করতেই হয়, তা হল বিবেকানন্দ তাঁর অল্প পরিসর জীবনের মধ্যেও পৃথিবীর দুঃখ-দারিদ্রের কারণ অন্বেষণে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ক্ষুদ্র পরিসরে নয়, তিনি চেয়েছিলেন বৃহৎ পরিসরের এই জগত-সংসারের রূপকে নিজে প্রত্যক্ষ করতে। আর এই পরিভ্রমণেই তিনি বিশ্ব-মানবজাতিকে এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের গৌরবময় দিকটিকে খুঁজে পান। সকল বিশ্ববাসীর কাছে তাড় রূপ উদঘাটন করেন। এই সর্বজনীন ঘটনাকে সামনে রেখে *গোরা* উপন্যাসের গোরা চরিত্রটিকে রাখতে চাইলে ঘটনার খুব বেশি তারতম্য ঘটে না। *গোরা* উপন্যাসের কাহিনিতেও দেখা যায়, গোরার নিজস্ব বিদ্রীহে বাড়ি ছেড়ে কিছুদিনের জন্য 'বিলাতি পর্যটক'দের মতো বেরোনোর কথা। গোরা আনন্দময়ীর নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে কিছুদিনের জন্য হলেও সরে গিয়ে আশ্রয় নেয় ঘোষপাড়া বলে একটি গ্রামে। সেখানে গিয়েই গোরার জগত-সংসার সম্পর্কে ধারণার রদবদল ঘটে।

দেশের ছোটোলোকদের দুর্দশা বুঝতে শেখে, নতুন করে জানতে শেখে। প্রতিটা মানুষের মধ্যে ভারতবর্ষের স্বরূপকেই বোঝার চেষ্টা করতে থাকে। গোরা নতুন ভাবে পরিবেশকে চিনতে থাকে। তার গোঁড়ামিও দূর হয়ে যায়। সমাজের ভেদাভেদ মুছে যায়। সে সকল কিছুকে সঙ্গে নিয়ে ভাবতে শেখে, বাঁচতে শেখে। চর-ঘোষপুরে গিয়ে অর্থাৎ ঘরের বাইরে পরিভ্রমণে বেরিয়ে সামগ্রিক ভারতবর্ষের রূপকে নতুন করে খুঁজে পেল।

> *ভদ্রসমাজ শিক্ষিতসমাজ ও কলিকাতা-সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ গোরা তাহা এই প্রথম দেখিল। এই নিভৃত প্রকান্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দূর্বল--- সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন--- প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত--- পৃথিবীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত--- তুচ্ছতাকে যে সে কতই বড়ো করিয়া জানে এবং সংস্কারমাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন--- তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ--- তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনোমতেই কল্পনা করিতে পারিত ন।।...এই অজ্ঞতা জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কী ভয়ংকর প্রকান্ড এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র সকলেরই কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না, এই কথা আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া গোরার চিত্ত রাত্রিদিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।*[২৫]

শুধু তাই নয়, যে গোরা লছমিয়ার হাতে খাবার খেত না কখনো, চর-ঘোষপুরে এসে তার চিন্তার বদল হল। যখন গোরা এবং তার সঙ্গী রমাপতি মুসলমান-পাড়ায় এসে দেখল গ্রামের একটি মাত্র হিন্দু ঘরে বৃদ্ধ নাপিত ও তার স্ত্রী মুসলমানের ছেলেকে পালন করছে, তারা অনাচার হিসেবেই তা গণ্য করেছিল। এই অবস্থায় বৃদ্ধ নাপিত তাদের বলে, হরি আল্লার কোনো তফাত নেই। এখান থেকেই এক দ্বন্দ্ব গোরার মধ্যে তৈরি হয়। সেই কারণেই আচার রক্ষার জন্য প্রখর

রৌদ্রেও, বিস্তীর্ণ বালুচর পেরিয়েও ক্রোশ-দেড়েক দূরে নীলকুঠির কাছারির তহসিলদার ব্রাহ্মণ মাধব চাটুজ্জের বাড়ি যেতে গিয়েও নাপিতের কাছে, সেখানে ম্লেচ্ছ আছে জেনেও ফিরে আসে। এবং এরপর থেকেই গোরার সংস্কারের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ভারতবর্ষের সামগ্রিক রূপ দ্বারা সে ভারতবর্ষকে চিনতে শেখে।

এই সকল বেশ কিছু ঘটনা বিবেকানন্দের জীবনের সঙ্গে কোথাও যেন সাদৃশ্য রচনা করে। পাঠকের কাছে গোরার আড়ালে বিবেকানন্দের ভাবমূর্তিকে রাখলে যেন সুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথ যেন ইচ্ছাকৃতই বিবেকানন্দের ভাবমূর্তিকে গোরার মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চান।

তবে, রবীন্দ্রনাথ *গোরা* উপন্যাসে নিবেদিতার প্রসঙ্গ নাকি বিবেকানন্দের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, তা এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে বলা উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে *গোরা* উপন্যাস লিখছেন। এবং সেখানে বিবেকানন্দের একটি ভাবমূর্তি স্বরূপ গোরা চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন--- এর আড়ালে কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা। লক্ষণীয় বিংশ শতাব্দীর শূণ্যর দশকেই বিবেকানন্দের মহাপ্রয়ান(৪ঠা জুলাই, ১৯০২) ঘটে। এর কয়েক বছর পরেই প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যসের প্রথম কিস্তি রচিত হয় ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে। এটাও মনে রাখতে হবে, এইসময় ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক আর্থিক পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে টালমাটাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব সমগ্র দেশ তথা বাংলাকে আক্রান্ত করে রেখেছে। এই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ একজন আদর্শপুরুষেরই অভাব বোধ করছিলেন। অন্তত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে যে তিনি খুবই চিন্তাশীল ছিলেন, সেকথা নিশ্চিত। ১৯০৮ সালে ‘পথ ও পাথেয়’ প্রবন্ধে বলছেন,

...আমাদের খবরের কাগজ প্রতিদিন খবর টানিয়া আনে; কিন্তু তাহার জালে যে সেদিন এমন একটা ঘড়া ঠেকিবে এবং ঘড়ার মধ্য হইতে এতবড়ো একটা ত্রাসজনক ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে তাহা আমরা কোনোদিন প্রত্যাশাও করিতে পারি নাই।[২৬]

অথবা, এই আশঙ্কা থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ তিনি তাঁর সময়কালের সুদূর এবং অদূর অতীতকে অনেকখানিই সমাজের কল্যাণ চেয়ে স্মরণ করছেন। এ প্রসঙ্গেও বিবেকানন্দের প্রসঙ্গের উল্লেখ করছেন।

ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে--- রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।[২৭]

রবীন্দ্রনাথ ততকালীন রাজনৈতিক অবস্থায় যে কতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন তা জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা থেকে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে,

গোরা উপন্যাস রচনা শুরু হয় বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলনের শেষভাগে, যখন রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদের অনেক বিবর্তন হইয়াছে।... তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন যে, হয় মানুষকে জাতীয়তার সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বিশ্বমানবতার ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, নয় তাহাকে মানবধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া জাতিপ্রেমের উষরক্ষেত্রে আত্মাহুতি দিতে হইবে।[২৮]

বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ নিজে যেন এই সংকটের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে একজন 'ভারত-পুরুষ'এর কল্পনা করছিলেন অথবা এমনই কোনো চরিত্রকেই উপস্থাপন করতে চাইছিলেন যা ভারতবাসীর কাছে স্বদেশ চেতনার আদর্শ হয়ে উঠতে পারে। অন্তত, তিনি দেশের মঙ্গল

কামনায় ব্যাপক ভাবে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। দেশের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানসিকতায় বুঝতে পারছিলেন, বাঙ্গলার আন্দোলন যে পথে চলছে তা ভারতবাসীকে মঙ্গলতীর্থে উপনীত করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সংকীর্ণ জাতীয়তা নয়, প্রকৃত মানবধর্মে উত্তীর্ণ হতে পারলে ভারতবর্ষের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব। তার জন্য আদর্শ একটি চরিত্রের সৃষ্টি বিশেষভাবে প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। সেই কারণেই যেন গোরা চরিত্রকে পাঠকের কাছে নায়ক করে তুলতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। বলা যায়, এই কারণেই গোরার উক্তি-প্রত্যুক্তি যতটা না বাস্তব সম্মত, তার থেকেও বেশি আদর্শমূলক। তার চিন্তাবোধে এক আদর্শ পরিকল্পিত দেশনায়কের মনোভাবই তুলনায় বেশি ফুটে ওঠে। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে *সমূহ* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ লিখছেন। *গোরা* রচনার প্রথম কিস্তি শুরু হচ্ছে ১৯০৭ সালে। রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা অথবা রচনার প্রবহমানতা থেকে বোঝা যায়, দেশীয় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য একজন প্রকৃত দেশনায়কের অভাব তিনি অনুভব করছিলেন। বলা যায়, অন্তরে তাঁর অন্বেষণও করছিলেন যেন। তাঁর 'দেশনায়ক' শীর্ষক প্রবন্ধে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

> *নায়কের কর্তব্য চালনা করা--- ভ্রমের পথেই হউক, আর ভ্রম সংশোধনের পথেই হউক। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে; কারণ, চলা স্বাস্থ্যকর, বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিকাল অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি তাহাতে অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি, নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্ব মোচন হইয়াছ।।...*
>
> *অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়গুলিকে একত্র করিতে হইবে,*

একজনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেদের মতবিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হইবে--- নতুবা আমাদের সার্থকতা-অন্বেষণের এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।[১৯]

এই দেশনায়কের অন্বেষণ, যা রবীন্দ্রনাথ করে চলেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে, তারই পরিপূর্ণতা যেন গোরার মধ্যে দিতে চেয়েছিলেন, এমনটা বলা যেতে পারে। দেশবোধ সম্পর্কে, স্বদেশপ্রীতির বিষয়ে একটি আধারের মধ্যে গোরাকে যেন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তার জন্য তাঁর জীবিতাবস্থায় স্বদেশপ্রেমের কারণে যাঁকে আদর্শ মনে করেছিলেন, তাঁরই প্রতিচ্ছবি গোরার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। *গোরা* উপন্যাসের আড়ালে এভাবেই বিবেকানন্দের অবদান রয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ভগিনী নিবেদিতা", *রবীন্দ্র রচনাবলী(নবম খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, শ্রাবণ ১৪২১, পৃ-৬১৩।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ভগিনী নিবেদিতা", *রবীন্দ্র রচনাবলী(নবম খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, শ্রাবণ ১৪২১, পৃ-৬১৩।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র ৬,* কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ-২০৬।

৪।Swami Saradananda, *Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda*(Edited by Barendranath Neogy), Kolkata: Bangiya Sahitya Parisad, August 2004, page-2.

৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী(২য় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ-২৮৩।

৬। ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য, *ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী,* কলিকাতাঃ অশোক প্রকাশন, শ্রাবণ ১৩৮৩, পৃ-৪৬।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গোরা", *রবীন্দ্র রচনাবলী(তৃতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, বৈশাখ ১৪২১, পৃ-৩৮৩।

৮। তদেব, পৃ-৫৭৫।

৯। জগদীশ ভট্টাচার্য, *জগদীশ ভট্টাচার্যের অগ্রন্থিত গদ্য*(সংকলন ও বিন্যাসঃ তপোব্রত ঘোষ), কলকাতাঃ ভারবি, জানুয়ারি ২০১২, পৃ-১৪৮।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গোরা", *রবীন্দ্র রচনাবলী(তৃতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, বৈশাখ ১৪২১, পৃ-৩৮৩।

১১। তদেব, পৃ-৪৭১।

১২। তদেব, পৃ-৪৮৬।

১৩। তদেব, পৃ-৩৯৮।

১৪। তদেব, পৃ-৩৯১।

১৫। তদেব, পৃ-৩৯১।

১৬। তদেব, পৃ-৩৯২।

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বদেশ", *রবীন্দ্র রচনাবলী(ষষ্ঠ খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, মাঘ ১৪২১, পৃ-৫৫৬।

১৮। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ কবি চিরন্তন,* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ-৬৪।

১৯। বিবেকানন্দ, "বর্তমান ভারত", *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (খন্ড-৬),* কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, আশ্বিন ১৩৮৮, পৃ-২৮৯।

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গোরা", *রবীন্দ্র রচনাবলী(তৃতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, বৈশাখ ১৪২১, পৃ-৪৩০।

২১। বিবেকানন্দ, "পত্রাবলী", *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (খন্ড-৬),* কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, আশ্বিন ১৩৮৮, পৃ-২৯৮।

২২। তদেব, পৃ-৩০১।

২৩। তদেব, পৃ-৩০২।

২৪। তদেব, পৃ-৩০৩।

২৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গোরা", *রবীন্দ্র রচনাবলী(তৃতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, বৈশাখ ১৪২১, পৃ-৪৮১।

২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পথ ও পাথেয়", *রবীন্দ্র রচনাবলী(পঞ্চম খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৪২১, পৃ-৬৬৪।

২৭। তদেব, পৃ-৬৬৮।

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "দেশনায়ক", *রবীন্দ্র রচনাবলী(পঞ্চম খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৪২১, পৃ-৬৯৬।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার ভাবনা এবং বর্তমান সময়ে *গোরা* উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার ভাবনা আলোচনার জন্য নতুন কোনো বিষয় নয়। এ নিয়ে আলোচনা দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে আশঙ্কা হতে পারে, তা বাঙালির কাছে পুনরায় চর্বিত-চর্বণ হয়ে পড়ছে কিনা। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর(১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) এত বছর পরেও এখনো রবীন্দ্ররচনাবলীর সামনে বসলে বাক্যের-পংক্তির প্রাসঙ্গিকতায় বর্তমান শতকেও তাঁর চরণধুলার 'পরে যেন মাথা নত হয়ে যায়। ফলে চর্বিত-চর্বণ বেশ কিছুটা হলেও তা নতুন ভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার অন্যতম একটি উপন্যাস *গোরা* বর্তমান শতাব্দীতে পুনরায় পাঠ করলে বোঝা যায় বেশ কিছু কাহিনির বক্তব্য বিষয় সাম্প্রতিক সময়েও সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে পড়ছে যেন। বর্তমান সময়ে *গোরা*-কে ফিরে দেখা অথবা এই সময়কালেও *গোরা*-র প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার চিন্তার আলোচনাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশচিন্তা তাঁর পারিবারিক পরিবেশের আনুকূল্যেই গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক বিষয়ে লেখা শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে, এমনটা মনে করা যেতে পারে। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতসম্রাজ্ঞী বলে ঘোষিত হন। তাঁরই প্রতিবাদের রূপ রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে পাওয়া যায়। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন লর্ড কার্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে গদ্যপ্রবন্ধ

লিখেছিলেন, লর্ড লিটনের সময় তা পদ্যে লিখেছিলেন। উল্লেখ্য, লর্ড লিটন রানি ভিক্টোরিয়াকে সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করেন। বলা যায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ তখন থেকেই ছিলেন সমাজসচেতন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জীবনস্মৃতি*র 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে লিখছেন, তাঁদের পরিবারে বিলাতিপ্রথার চল থাকলেও স্বদেশের প্রতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধাই পরিবারের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের বোধ সঞ্চার করে রেখেছিল। স্বদেশচেতনার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> *আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।*

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে অর্থাৎ আশি-নব্বই-এর দশকে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রবন্ধ (চেঁচিয়ে বলা, অকালকুষ্মান্ড, হাতে-কলমে, রাজনীতির দ্বিধা, অপমানের প্রতিকার, কণ্ঠরোধ) এবং স্বদেশী গান (আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, আগে চল (ভাই) আগে চল), ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের ১২শ অধিবেশনে নিজস্ব সুরে 'বন্দেমাতরম' গান কলিকাতায় বিডন স্কোয়ারে) লিখলেও তা জাতীয়তাবোধের সম্পূর্ণ আকার তখনো নিতে পারেনি। স্বদেশী চিন্তা ক্রমে জাতীয়তাবাদী চিন্তায় পরিণত হয় বিংশ শতাব্দীর শূণ্যর দশকে, মূলত বয়কট আন্দোলনের সূত্রপাত এবং বঙ্গচ্ছেদ (১৯০৫, অক্টোবর ১৬) ঘোষিত হওয়ার সমসময়ে। বলা যায়, এরপর থেকেই রবীন্দ্রনাথের কলমে উঠে আসে একের পর এক ভারতবর্ষের চিন্তা, 'নেশন'এর চিন্তা। এই ভারতবর্ষের চিন্তা, 'নেশন' সংক্রান্ত চিন্তা প্রবন্ধাকারে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তি, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই একটি জাতির ধারণার প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকে। 'নেশন কী' প্রবন্ধে এমনই বলতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নেশন' কথার বাংলায়

কোনো প্রতিশব্দ নেই। 'নেশন' বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। নেশনের ধারণা শুধুমাত্র একটি ভূখন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। রেঁনার মত গ্রহণ করে তিনি 'নেশন'এর ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন,

> *অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চারিত্র সৃজন করে তাহাই নেশন।*[৮]

প্রাচীন ভারতে 'নেশন' বা 'জাতীয়তাবাদ' শব্দগুলির বিশেষ প্রয়োগ ছিল না। ধীরে ধীরে সময় পেরিয়েছে--- মানুষ নিজেদের আরো সুসংঘবদ্ধ করবার তাগিদে এবং অভিপ্রায়ে 'নেশন'বোধকে দৃঢ় করেছে। এই 'নেশন'বোধ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'নেশন' কিভাবে মানুষকে সুদৃঢ় করতে পারে, তা ছিল তাঁর চিন্তার বিষয়। তিনি বলেছেন, 'জাতি' কথাটি একটি ধারণা হিসাবে ধরা যেতে পারে। কোনো জাতি বা ভাষাকে ভিত্তি করে এই 'নেশন'বোধ বা 'জাতি'বোধ সুদৃঢ় হতে পারে না। তবে, 'জাতীয়' কথাটি এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের ধারণা কোন সময়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করল অথবা মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার অভিপ্রায় কোন সময়ে ভারতীয় উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ভাবিয়েছিল তা লক্ষ্য করার বিষয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষের ওপর অনেকবার বিদেশীদের আক্রমণ ঘটেছে। তবে, বৃটিশ শক্তি যখন বানিজ্যের প্রলোভনে ভারতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন রামমোহন রায়ের মতো পন্ডিতরা পীড়িত ভারতবর্ষকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ভারতবাসীকে একই সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করলেন রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরো অনেকে। এঁরা প্রত্যেকেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই স্বপ্নে ভাষা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, পাশ্চাত্য থেকে অনুকরণ করে নয়, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ভারতীয় চিন্তাভাবনা বা ভারতীয় ধাঁচেই ঘটানো সম্ভব।

তবে, সেসময় জাতীয়তাবাদ বলতে বুঝেছিলেন অন্য জাতির তুলনায় নিজ জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবনাকে তাঁর সাহিত্যে বক্তৃতায় নানাভাবে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। শুধুমাত্র নিজজাতিকে শ্রেষ্ঠ বলার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মাকে তিনি সঙ্কীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ করতে চাননি। তিনি বুঝেছিলেন, মানুষের অন্তরে মুক্তির শুভবুদ্ধি যদি জাগ্রত না হয় তবে, বাহিরের মুক্তির ভার তার পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হবে। জাতীয়তার চিন্তায় তিনি সাময়িক উত্তেজনায় বিশ্বাসী ছিলেন না, গভীর চিন্তনের দ্বারা এই সমাজব্যাধির সমাধানে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি দেশীয় সংকটকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করে বিশ্বমানবতাবাদকে যেন প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে,

> *সমস্ত ভারতের অন্তরে যুগান্তর আনাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। লোকাচারের অতি ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে বহুদিনের অসাড় শিকড়গুলো বাইরের থেকে রস সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। সেই ক্ষীণ জীবনীশক্তিতে প্রাণসঞ্চার করার জন্যই তিনি বাইরের জগতের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র বাঁধবার চেষ্টা করছিলেন। জাতীয় জীবনে যাতে নতুন উন্মেষ দেখা দেয়, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।*[৪]

ভারতবর্ষীয় সমাজ-এও প্রাবন্ধিক সামগ্রিক ভারতবর্ষের একত্রে জাগরণের আকাঙ্খা করছেন। তিনি একটি ঐক্য নির্মাণ করতে চাইছেন। যে কারণেই হয়তো এমন কথা উঠে আসছে,

> *সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য--- বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা...এই এক করিবার শক্তি ও কার্যকে ন্যাশনাল নাম দাও বা যে-কোনো নাম দাও, তাহাতে কিছু আসে যায় না, মানুষ-বাঁধা লইয়াই বিষয়।*[৪]

এখানে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তাকে মনে রেখে বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিকতার কথা ভাবলে বলা যায় সমাজ গড়ে তোলার পরিবর্তে সমাজের খন্ডতার প্রবণতা প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয়তাবাদী চিন্তার সুস্পষ্ট মনোভাব পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে নিয়ে, স্বদেশচেতনা নিয়ে যে কতটা কুণ্ঠিত কতটা চিন্তিত ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর লেখনীতে---

> *এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্মেন্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন--- স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!*[৪]

অথবা, স্বদেশ সংক্রান্ত চিন্তা এবং তা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছেন।

পাশ্চাত্যের অনুকরণকে বর্জন করতে চাইছেন, স্বদেশী দ্রব্য-আচার-অভ্যাসকে গ্রহণ করতে চাইছেন।

> *পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।...*
>
> *মনে করো, প্রোভিনশ্যাল কনফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্লাদে*

দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাঙ্গলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।[৬]

রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশবোধের সঙ্গে গোরার দেশের প্রতি শ্রদ্ধাকে মিলিয়ে দেখতে অসুবিধা হয় না। এখানে লক্ষ্য করার, প্রবন্ধটি রচিত হচ্ছে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। মনে রাখা দরকার, এর কয়েকবছর পরেই রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাসের প্রথম কিস্তি রচনা করছেন। এই প্রবন্ধগুলি সামনে রেখে *গোরা* পাঠ করলে তাঁর স্বদেশভাবনা আরো স্পষ্ট হবে। একইসঙ্গে বোঝা যাবে তাঁর স্বদেশ সংক্রান্ত ভাবনাগুলি এক প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে পরিণত থেকে পরিণততর হচ্ছে। *গোরা*-র মধ্যে এই ভাবনারই একটি পূর্ণ রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। দেশীয় আচার-অভ্যাস-সংস্কারকে গোরাও তার নিজস্ব স্বাজাত্যাভিমানের অধিকার মনে করেছিল।

এই সময়কালেই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। কখনও প্রবন্ধে (সফলতার সদুপায়, অবস্থা ও ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রভৃতি) কখনো গানে কবিতায় নাটকে উপন্যাসে ছোটোগল্পে, সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে তা প্রকাশিত হচ্ছে। গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্যর গানগুলি এই সময়পর্বে রচিত হচ্ছে, নৈবেদ্য-র কবিতাগুলির উল্লেখও করা যায়, যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভারতভাবনা স্বদেশবোধকে জাগ্রত হচ্ছে। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধের চিন্তার বীজ। মূলত এই রচনাগুলির মধ্য দিয়েই তা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। কোথাও কোথাও এই জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ই

আন্তর্জাতিক চিন্তায় রূপ পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির যে গানটির কথা উল্লেখ করতেই হয়, তা হল, ১০৬ নং গানটি---

হে মোর চিত্ত, পূণ্য তীর্থে

জাগো রে ধীরে---

এই ভারতের মহামানবের

সাগরতীরে।

...

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,

হিন্দু মুসলমান।

এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,

এসো এসো খৃস্টান।

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন

ধরো হাত সবাকার,

এসো হে পতিত করো অপনীত

সব অপমানভার।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা

মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,

সবারে-পরশে-পবিত্র-করা

তীর্থনীরে।

আজি ভারতের মহামানবের

সাগরতীরে।[৪]

এখানে রবীন্দ্রনাথ যেমন হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান, আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়-চীন-শক-হুন-পাঠান-মোঘলকে যেমন ভারতের তীর্থে মিলনে সামিল হওয়ার স্বাগত জানিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে ব্রাহ্মণকে পবিত্র মন নিয়ে দেশের অবহেলিত, অবমানিত, পতিতদের হাত ধরতে বলেছেন। সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের জাগরণ প্রার্থনা করেছেন। পিছিয়ে পড়া ভারতবর্ষের জন্য এ তাঁর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার শুভাকাঙ্খা এমনটা বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গানের মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথ একই বার্তা প্রেরণ করছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, উপকার করব ভাবলেই তা সার্থক হয়না। যাদের জন্য করা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে মিশেই, তাদের সমান হয়েই কাজ করতে হবে। বঞ্চিতদের দেবতা জ্ঞানে তাদের নিয়েই একত্রে জাগ্রত হতে হবে। তবেই ঘটবে প্রকৃত জাগরণ। ১০৮ নং গানে তাই বলেছেন-

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান!

মানুষের অধিকারে

বঞ্চিত করেছ যারে

সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

...

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে

পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

অজ্ঞানের অন্ধকারে

আড়ালে ঢাকিছ যারে

তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।[৮]

পরবর্তীতে 'কালান্তর'এও এমনি বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন,

> *আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হলে চলিবে না, ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে।*[৯]

অথবা বলেছেন,

> *আমাদের সমাজ লোকসাধারনকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে।... এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি সদুপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে।*[১০]

এখানেও সেই সমগ্র ভারতবর্ষের ভাবনার কথাই বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ চল্লিশ বছরে লেখা ছোটোগল্প(সংস্কার) এ দেখা যায়, তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধারণার ক্ষতিকর দিকটিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সংকীর্ণ লোকাচারের আবদ্ধতার কথা বলেছেন। যা তৎকালীন সমাজের অবস্থারও পরিচয় বহন করে। এ প্রসঙ্গে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের রূপটিও রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্পের মধ্যে ব্যবহারিক প্রয়োগে দেখাতে চেয়েছেন। এখানে 'সংস্কার' গল্পের অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

> *তখনকার পুলিশ কারও বাড়ীতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেত। তখনকার দেশভক্ত যদি দেখত কারও ঘরে বিলিতি বইয়ের পাতা কাটা তবেঁ তাকে জানত দেশবিদ্রোহী।*[৯]

এই উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকে এখনো ভারতবর্ষের সমাজ মুক্ত হতে পারেনি। একবিংশ শতকেও এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। যদিও 'সংস্কার' ছোটোগল্প অথবা 'কালান্তর' গ্রন্থ *গোরা* রচনার পরে লেখা। তবুও তা রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন সময়ের জাতীয়তার চিন্তাকেই স্পষ্ট করে। কবিতার মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আহ্বান শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময় থেকে যে সকল রাজনৈতিক প্রবন্ধ অথবা গান কবিতা রচিত হচ্ছে, সেই মনোভাবের একতি ফলিত রূপ বিংশ শতাব্দীতে *গোরা* উপন্যাসে পাওয়া গেছে, এমনটা মনে করা যেতে পারে। বলা যেতে পারে, সেই কারণেই উপন্যাসের নায়ক চরিত্র গোরা অনেক বেশি আদর্শ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গোরাকে 'আদর্শ-পুরুষ' হিসাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা, এ যেন রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার ফসল।

স্বদেশবোধ নিয়ে তথা জাতীয়তাবাদী চিন্তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে যা বলছেন, সেই কথারই যেন পুনরাবৃত্তি *গোরা* উপন্যাসে কখনও গোরা কখনও বিনয়, পরেশবাবু, সুচরিতা অথবা আনন্দময়ীর কথোপকথনে প্রকাশ পেয়েছে। পাঠের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য রচনা সমান্তরালে রাখলে পাঠকের চোখে তা স্পষ্ট হতে পারে।

সামগ্রিক ভারতবর্ষের যে জাগরণ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন, তা-ই যেন গোরার কথোপথনে উঠে আসছে। গোরাও চাইছে ত্রিবেণীতে, যেখানে সকল তীর্থযাত্রী এক হবে, সেখানে জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে এক করে মিশিয়ে দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের সঙ্গে মিশিয়ে নিজেকে সমর্পণ করবে। আবার কখনো সে দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দশাকে স্বীকার করে নিয়েই দেশের প্রতি শ্রদ্ধাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। দেশের যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের অস্বীকার বা অবহেলিত করে নয়। এই প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচিত গীতাঞ্জলির গানদুটি সম্পর্কিত। এছাড়াও, গোরার কথোপকথনে বারবার উঠে আসছে সমগ্র নিয়েই ভারতবর্ষের সকল দেশের সেরা হওয়ার ভাবনা। বিনয়কে সে বলছে,

> *নীচের লোকদের নিষ্কৃতি না দিলে কখনোই তোমাদের যথার্থ নিষ্কৃতি নেই। নৌকার খোলে যদি ছিদ্র থাকে তবে নৌকার মাস্তুল কখনোই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারবে না, তা তিনি যতই উচ্চে থাকুন-না কেন।*[২]

অথবা,

> *ঐ-যে ভূতের ওঝা এসে আমার নন্দকে মেরে গেছে তার মার আমাকে লাগছে, আমার সমস্ত দেশকে লাগছে। আমি এই-সব ব্যাপারকে এক-একটা ছোটো এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে কোনোমতেই দেখতে পারি নে।*[৩]

সেই সমগ্রের চেতনা শুধুমাত্র পতিত-অবহেলিত-অবমানিতদের প্রতিও যেমন দেখানো হয়েছে, তারও সঙ্গে নারীজাতির ওপরও তা বর্ষিত হয়েছে। নারীও যেখানে সমান মর্যাদায় সমাজে পুরুষের সঙ্গে একাসনে বসতে পারে নি। উপন্যাসে তা বিনয়ের চোখে ধরা পড়েছে,

> *বিনয়। ...আমরা যেমন চাষাকে কেবলমাত্র তার চাষবাস, তাঁতিকে তার কাপড়-তৈরির মধ্যে দেখি বলে তাদের ছোটোলোক বলে অবজ্ঞা করি, তারা সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের চোখে পড়ে*

না, এবং ছোটোলোক-ভদ্রলোকের সেই বিচ্ছেদের দ্বারাই দেশ দুর্বল হয়েছে, ঠিক সেইরকম কারণেই দেশের মেয়েদের কেবল তাদের রান্নাবান্না বাটনা-বাটার মধ্যে আবদ্ধ করে দেখছি বলেই মেয়েদের মেয়েমানুষ বলে অত্যন্ত খাটো করে দেখি--- এতে করে আমাদের সমস্ত দেশই খাটো হয়ে গেছে।[৮]

গোরা উপন্যাসের প্রথমে এই যুক্তিতে বিশ্বাসী না হলেও উপন্যাসের শেষের অংশে সে নিজেই এই মতকে গ্রহণ করে নেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ভাবনায় যেন তাঁর সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সামগ্রিক ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে সকল ভারতবাসীর জাগরণের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ-গান কবিতায় যেমন লিখেছেন, গোরার উক্তিতেও তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। শুধুমাত্র গোরা চরিত্র নয়, স্বদেশবোধ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা *গোরা* উপন্যাসে সামগ্রিকভাবে চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে পূর্ণতা পায়। কখনো তা গোরা-বিনয়-সুচরিতা-পরেশবাবু-আনন্দময়ীর চরিত্রে। পাঠ্যাংশে জাতিভেদকে ঘৃণা করা হয় কেন এ প্রশ্ন যখন সুচরিতা পরেশবাবুকে করেছে, তিনি তখন বলেছেন,

একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়, মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কী বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনোই পৃথিবীতে বড়ো হতে পারে না, অন্যের অবজ্ঞা তাদের সইতেই হবে।[৯]

এখানে আবারও সেই সামগ্রিক ভারতবর্ষের রূপের পিছিয়ে পড়ার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। সেই পিছিয়ে পড়া ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন পরেশবাবু এবং তা থেকে মুক্তির সম্ভাব্য সমাধানের উপায় বের করার চেষ্টা করেছেন উপন্যাসে। তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলে শুধুমাত্র ব্রাহ্মধর্মের মহত্বের কথা বলেননি, হিন্দু-মুসলিম-খৃস্টান সকলের তিনি মঙ্গলকামনা

করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সম্প্রদায় এমন এক জিনিস, যে তা মানুষ যে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, সে যে হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম অথবা এমন লঘু কিছু পরিচয় বহন করে জন্ম নেয় না এই পৃথিবীতে, এই সত্যটাই ভুলিয়ে দিতে পারে।

এই ছোটো ছোটো উদাহরণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত রচনায় এবং বিশেষভাবে উল্লেখ্য *গোরা*-তে ধর্ম-জাতির নিরিখে জাতীয়তাবাদের রূপটিকে তুলে ধরেছেন অথবা কখনো উগ্র জাতীয়তার দিকটিকে ইঙ্গিত করে তা থেকে ক্রমে বিশ্বমানবতার ভাবনায় *পৌঁছেছেন।* উপন্যাসের শেষে রক্ষনশীল-গোঁড়া মানসিকতার গোরা সমগ্র ভারতবর্ষের জাগরণে উত্তীর্ণ হয়েছে। সেখানেই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের উদয় হয়েছে। গোরা আনন্দময়ীর মধ্যে ভারতের পূর্ণরূপের সন্ধান পেয়েছে।

> *গোরা কহিল, "মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই--- শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।*[৮]

এখানেই ভারতবর্ষের পূর্ণরূপের মধ্যে আড়ালে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বার্তাটিই ঘোষিত হয়েছে। রাগ-দ্বেষ-হিংসা-বিবাদ ভুলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারততীর্থে মিলনের আহ্বান করা হয়েছে। *গোরা*-র মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য গান-কবিতা-ছোটোগল্প-উপন্যাস মূলত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তার স্ফুরণ ঘটেছে। এক্ষেত্রে বলতেই হয়, শুধুমাত্র জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিচারে নয়, বিশ্বপরিভ্রমণের মধ্যেও দেশের সঙ্গে বিদেশের যে যোগাযোগ সূত্র স্থাপিত হয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেও তার অনুষঙ্গ ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক ভাবনাটিকে স্পষ্ট করেছেন।

গোরা রচনার একশো বছর পরেও রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার ভাবনাকে অপ্রাসঙ্গিক বলে অনায়াসে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। বর্তমান সমাজের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনির ঘটনাপ্রবাহ আলাদা করা প্রায় পৃথক হয়ে পড়ে। সময়ের পরিবর্তন হলেও চিন্তাভাবনার যে বিশেষ রদবদল হয়নি তা উপন্যাস পড়লে মনে হয়। একশো বছর পর আজও *গোরা* বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। যে জাতিভেদের ভিন্নতা, ধর্ম-বর্ণের নিরিখে শ্রেণিতে-শ্রেণিতে দ্বন্দ্ব মানুষে-মানুষে বিভেদ--- তা যেমন *গোরা* রচনার সময়ও ছিল, সেই সমস্যা একবিংশ শতকে এসেও, *গোরা* রচনার একশো বছর পরেও বর্তমান রয়েছে। *গোরা* রচনার আগে যে এই সমস্যা ছিল না, এমনটা নয়। অবশ্যই ছিল। কিন্তু, *গোরা* রচনার সময় যেখানে এই বিভেদ নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে ভাবা হচ্ছে, সেখানে এত বছর পরেও এই সমস্যার হ্রাসের কোনো পরিবর্তন নেই। দেশজুড়ে এই সমস্যা নিয়ে নবজাগরণের সময় থেকে তোলপাড় হচ্ছে; রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস সমাধানের উপায় বের করার চেষ্টা করছেন, তারপরেও অবস্থার ইতিবাচক বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। সমস্যা হ্রাস পাওয়ার বদলে ক্রমে তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। আজ থেকে একশো বছরেরও পূর্বে যে সমস্যা নিয়ে ভাবা হয়েছিল, বহু পরিকল্পনার আদর্শ পুরুষ নির্মিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে, সেই সমস্যার সমাধান শতবর্ষ পেরিয়েও সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ সময়ের পরও গোরার ভাবনা, তাঁর স্বাজাত্যবোধ, এই সময়ে কতটা উপযোগী তা *গোরা* পাঠে ধারণা পাওয়া যায়। সর্বধর্মসম্প্রদায় আজকের জটিল রাজনীতির পরিস্থিতিতে প্রয়োজন। যে সময়ের মধ্য দিয়ে আজকের প্রজন্ম তাদের যাপন অতিক্রম করছে, তা এক ভয়াবহ সংকট। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে গেলেই *গোরা* আজকের দিনে বড় সত্য ভূমিকা পালন করে। আজকের দিনে *গোরা* বড্ড বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে আসে।

বর্তমান সময় *গোরা*-র রচনার সময় থেকে অনেক বছর এগিয়ে গেছে। এই সময়পর্বের মধ্যে ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীতে ঘটে গেছে বহু বহু দাঙ্গা আন্দোলন বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়ংকর নৃশংস ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই *গোরা* রচনার কয়েকবছরের মধ্যেই ঘটে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এরপরই ভারতবর্ষের রূপ-রাজনীতি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় দুই দশক পরেই সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ঘটে যায় আরও ব্যাপক এক ধ্বংসলীলা। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় দুই বছর আগে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশ বছরে সমাজের-রাজনীতির যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর কলম কখনোই থেমে থাকে নি। বিশ্ব জুড়ে, মানবেতিহাস জুড়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া যে তখনও থেমে থাকবে না, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বের রাজনৈতিক মনোভাবের সঙ্গে তাঁর জীবনের শেষপর্বের রাজনৈতিক মনোভাবের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখা সেই জটিল পরিস্থিতিতেও কঠিন জেনেও তিনি মানুষের প্রতি আস্থা রাখছেন। তিনি বুঝেছিলেন, মানুষের ওপর আস্থা হারালে এই বাস্তব নিষ্ঠুর সমাজের সভ্যতার রথ এগোনোর পরিবর্তে ক্রমে অবনতির পথে চলতে শুরু করবে। তখন লেখা রাজনৈতিক লেখালেখির মধ্যেও তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন চোখে পড়ে। এসব সত্ত্বেও *গোরা* তাঁর লেখা গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। সেখানে ভারতবোধের জাগরণের যে দিকটি, আদর্শ ভারত-পুরুষ এর কল্পনা *গোরা*-তেই চোখে পড়ে। উগ্র জাতীয়তা নয়, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের মতো মঙ্গল ভাবনাতেই সমাজের, দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন হতে পারে।

তবে, এতো গেল রবীন্দ্র-জীবৎকালের সমসাময়িক পরিস্থিতি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষের রূপ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। রবীন্দ্র-মৃত্যুর দশকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম ভারতবর্ষকে তথা সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে। এরপর বিয়াল্লিশের মন্বন্তর,

ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশকে সন্ত্রস্ত করে। সাতচল্লিশের দেশভাগের সময়েই সাম্প্রদায়িকতা তীব্র রূপ ধারণ করে। এরপরও একের পর এক আন্দোলন ভারতে ঘটে যায়, যেমন তেভাগা আন্দোমন, মরিচ ঝাঁপির ঘটনা, নকশাল আন্দোলন প্রভৃতি। তবে, দেশভাগের পরে অন্যতম বড়ো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অযোধ্যাকান্ডের ঘটনায় ঘটে। অযোধ্যাকান্ডের ঘটনায় (৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ ক্রিস্টাব্দ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। বিংশ শতাব্দীর শেষাংশ অর্থাৎ বর্তমান সময়পর্ব থেকে প্রায় তিন দশক পিছিয়ে--- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির সাক্ষী হয় ভারতভূমি। ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিপর্যয়ে ভারতবর্ষ অতল তিমিরে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভারতবর্ষ আর ধর্ম-নিরপেক্ষ থাকে না। বাবরি মসজিদের ঘটনার পর ভারতবর্ষ আর বিশ্বজনীন থাকে না। এরপরও ভারতের রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়েছে ঠিকই, তবে অভ্যন্তরীণ জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এত পরিবর্তন হওয়ার পরেও *গোরা*-কে ফিরে দেখা এতটা সময় পরে অনেকসময় অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতিভেদের সমস্যা একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসেও ক্ষুন্ন হয়নি। বরং এই সভ্য সমাজেও তার একটি নগ্ন রূপ ক্রমে বীভৎস হয়ে উঠছে। ঠিক এইখানেই *গোরা* আজকের দিনে বড়ো প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি শতকে ভারতবর্ষে বীভৎস দাঙ্গা ঘটে গেছে, যা মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। ২০১৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ভারতের উত্তরপ্রদেশের দাদরির নিকটে বিসরা গ্রামে গোমাংস রাখা আছে সন্দেহে মহম্মদ আখলাক নামের এক ৫২ বছর বয়সী ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।[১৭] চতুর্দিক রোষে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। একদল মানুষ নিজস্বার্থে দাঙ্গা ঘটানোর কারণে ধর্মীয় সংস্কারকে এই দাঙ্গার ভিত্তি করতে চাইছে। তাই 'গোমাংস'কে দাঙ্গার কারণ করতে চাইছে। শুধু একটি ঘটনা নয়, ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় হিন্দু-মুসলমান

সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে যে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল, তা মানুষের কাছে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।[১৮] ২০১৮ সালের ২২শে জুন জুনেইদ খান যখন দিল্লী থেকে ট্রেনে হরিয়ানার বল্লভগড়ে ফিরছিলেন, তখন তার ব্যাগে গোরুর মাংস আছে রটিয়ে দিয়ে হিংস্র কিছু লোক ধারালো অস্ত্রের দ্বারা তাকে খুন করে।[১৯] এই সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতির মধ্য দিয়ে যেভাবে ভারতবর্ষকে খন্ড করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে বলা যায়, *গোরা*-ই সবথেকে বেশি প্রাসঙ্গিক।

গোরা-তে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিনাশ চেয়ে বিশ্বমানবতার ধর্মকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে এমন সাম্প্রদায়িক বিভেদ সমাজের পক্ষে আশঙ্কার কারণ। এখানেই একশো বছর পরও *গোরা* প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথ গোরাকে জন্মসূত্রে আইরিশ সন্তান হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন। অথচ তার ছিল অগাধ ভারতবর্ষের প্রতি নিষ্ঠা। কাহিনির শেষে সে যখন জানতে পারে, সে মিউটিনির সময়ে কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান, আনন্দময়ী এবং কৃষ্ণদয়াল তাকে পালন করেছে মাত্র, তখন এক মুহূর্তে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তাঁর প্রবল বিশ্বাস। সেই আঘাতেই জন্ম নেয় এক অনন্য অনুভূতি। সে পরেশবাবুর কাছে গিয়ে বলে,

> *না, আমি হিন্দু নই।...আমি আজ মুক্ত পরেশবাবু! আমি যে পতিত হব, ব্রাত্য হব, সে ভয় আর আমার নেই--- আমাকে আর পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না। ... আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌঁচেছে--- আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি--- সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে--- সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়--- সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।*[২০]

গোরার এই যে উপলব্ধি, এখানেই শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্ব তাকে দুবাহু বাড়িয়ে স্বাগত জানিয়েছে। গোরা এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই বিশ্বমানবতার দ্বারকে অবারিত করেছে। যে গোরা আগে হিন্দুত্ববাদের প্রচারে অন্ধ হয়ে পড়েছিল, সেই আবার বিশ্বমানবতার ধর্মে নিজেকে শুদ্ধ করেছে। যে ভারতমন্ত্র সে বিরোধে-বিবাদে-আচারে-সংস্কারে খুঁজে চলেছিল দীর্ঘদিন, তা সে পরেশবাবুর কাছে খুঁজে পেয়েছে। তাই পরেশবাবুকে সে বলেছে---

> *আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে...আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই--- যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না...।*[৯]

এই বাক্যের দ্বারা গোরার বিশ্বমানবতার চেতনা স্পষ্ট হয়েছে। গোরাকে রবীন্দ্রনাথ পাঠকের কাছে ভারতবর্ষের আদর্শ পুরুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিশ্বমানবতার বার্তায় তাকে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন--- যেভাবে উপন্যাসের শেষে গোরাকে দেখা যায়। সেই ভাবনায় উপন্যাসে লক্ষণীয়। এখানে বলা যায়, ব্যক্তিমানসের ভাবনা-ই তার সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলে, অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ভাবনায় ঋদ্ধ হয়ে গোরার মধ্য দিয়ে সেই স্বদেশ প্রেমকে তুলে ধরেছিলেন--- একথা বলাবাহুল্য। অতএব বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধের চিন্তার একটি অংশ *গোরা*-র মধ্যে ফুটে উঠেছে। তবে, শুধু *গোরা*-র স্বদেশপ্রেম নিয়ে আবদ্ধ থাকলে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে *গোরা*-তে রবীন্দ্রনাথ কোন বার্তা দিতে চেয়েছিলেন, তা-ও পূর্ণতা পায় না। এ প্রসঙ্গে *শান্তিনিকেতন* গ্রন্থের "তপোবন" প্রবন্ধটির অংশ উল্লেখ করা হল, যা তাঁর ব্যক্তিমানসের স্বদেশবোধের চিন্তাকে বহন করে---

> *আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে, সে সত্যটি কি। সে সত্য প্রধানত বনিকবৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। ...ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার*

তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরাজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে--- দাস ভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে, ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানা দিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে।[২]

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তায় গোরার মধ্যে প্রতিফলিত হলে জাতীয়তাবোধের পূর্ণ রূপ তুলে ধরে। রবীন্দ্র গুপ্তের ভাষায় তা খানিকটা---

প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অবহিত চিত্তে নানা সংঘর্ষে নিজের নির্মোক ভাঙতে ভাঙতে গোরার ঐ বিশ্বজাগতিক বোধেই উত্তরণ; অবশ্য তাতে জাতীয়তাবোধেরও পূর্ণতা।[৩]

এ তো গেল গোরার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন স্বদেশপ্রেমকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, কেমন আদর্শ ভারতবর্ষের কল্পনা তিনি নিজের মননে লালন করেছিলেন। তবে, এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে কল্পনাটুকু অথবা আকাঙ্খা নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন তা সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের প্রতি মঙ্গলজনক। বর্তমান শতাব্দীতে সেই ভাবনার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হতে পারে, কিন্তু আকাঙ্খা করা অন্যায় নয়। সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িকতায় বরং রবীন্দ্রনাথের এই বার্তা বড়ো বেশি প্রয়োজন। *গোরা* রচনার একশো বছর অতিক্রম করেও সাম্প্রদায়িক হিংসা অথবা জাতিভেদের সমস্যা আজও ভারতবর্ষের কাছে এক জ্বলন্ত সমস্যা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অযোধ্যাকান্ডে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার সর্বনাশার প্রভাবে ভারতবর্ষ আজও কলুষমুক্ত হতে পারেনি। বলা যায়, কলুষমুক্ত হওয়া নয়, ক্রমে সমাজের অর্থনীতি-রাজনীতির জটিল পরিস্থিতিতে তা আরও বেশিমাত্রায় কলুষিত হচ্ছে। আদর্শের বিচারে যা সমাজ থেকে নির্মূল হওয়া উচিত, তাকে মাধ্যম করেই বর্তমান সমাজ একটু একটু করে দিনের পর দিন 'সভ্যতা'র পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এই সমাজের চিন্তাভাবনাকে কতটা 'সভ্য' বলা যাবে, আজকের দিনে এ এক বড়ো সংশয়ের বিষয়। বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তির যুগে স্মার্টফোনের যুগে

এই সভ্যতার রথ সত্যিই কতটা আশাজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে, তা নিঃসংশয়ে বলতে গেলে কোথাও যেন হোঁচট খেতে হচ্ছে। সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই রাজ্যে-দেশে ঘটে যাচ্ছে একের পর এক নিষ্ঠুর ঘটনা। ধর্মকে কেন্দ্র করেই ঘটে চলেছে একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কখনো কখনো বিশেষ একটি প্রাণী হত্যা নিয়েও চলছে হত্যাকান্ডের জল্পনা-কল্পনা, তার সঙ্গেও সম্পর্কিত রয়েছে সেই সম্প্রদায়। জাতিভেদের সমস্যার কারণে এই শতকে এসেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও একজন ছাত্রকে অসহায় বোধ করতে হচ্ছে। ১৭ই জানুয়ারি ২০১৬ সালে হায়দ্রাবাদ ইউনিভার্সিটির ছাত্র রোহিত ভেমুলাকে দলিত বলে অপমানিত হতে হয়।[২৪] তার পরিমান এতটাই ভয়ংকর হয়ে ওঠে যে এই ঘটনার প্রতিবাদ স্বরূপ রোহিত আত্মহত্যা করে। এটি শুধুমাত্র তার পরাজয় নয়। রাষ্ট্রের এই চরিত্রের প্রতি তার প্রতিবাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার প্রতি প্রতিবাদ। সমগ্র দেশের পক্ষে এমন ঘটনা অভিশাপই বটে। ক্রমে সভ্যতার রথ এগোনোর পরিবর্তে পিছিয়ে পড়ছে। যেখানে মানুষে-মানুষে এত দাঙ্গা হাঙ্গামা বিরোধ হিংসা হানাহানি সেখানে মানুষ ভালো থাকতে পারে না, সত্যি এ বড়ো সুখের সময় নয়, এ বড়ো আনন্দের সময় নয়। এ এক সংকটের সময়। এই পরিস্থিতিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষায় বলা যেতে পারে,

মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও

মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও

মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

...

এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও

মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও

মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।[৫]

এই পরিস্থিতির জন্য বিশ্বমানবতাবাদ মৈত্রীর অবশ্য প্রয়োজন আর তা নির্মানের জন্য প্রয়োজন আদর্শ 'ভারত-পুরুষ'এর। এখানেই *গোরা* একশো বছর আগেরই শুধুমাত্র নয়, বর্তমান সময়েরও যুগোপযোগী নায়ক একথা বলা যেতে পারে।

যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের নেশায় বর্তমান পৃথিবী উল্লম্ফন করে দাপিয়ে বেরাচ্ছে, তা সমাধানের উপায় কি অথবা নির্মূল হওয়া আদৌ কতটা সম্ভব অথবা হলেও তা হয়তো শত শতাব্দীর মনিষীর কাজের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কিনা তা প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। সেই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা আশু প্রয়োজন। এ সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ মহাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে,

দেশে কখনও কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হলে আমরা একটা মিছিলের আয়োজন করি--- এটা আমাদের অভ্যাসের অন্তর্গত হয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি নিতান্ত এই সাময়িক দায়িত্ব পালনে মূল সমস্যার দিকে আমরা পৌঁছতেই পারি না। যদি তা হত তবে দীর্ঘকাল জুড়ে এই উৎকট ব্যাধি আমাদের সমাজে এতদিন স্থায়ী হতে পারত না। দুই বা একাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়ের যে অভাব এতদিন ধরে থেকে গেছে তার মুক্তির কোন আয়োজন যদি না করা যায় তাহলে আমাদের মাঝে মাঝেই এরকম দাঙ্গা-হাঙ্গামার মুখে পড়তে হবে, আর তখন সাময়িকভাবে কিছু শ্লোগান, মিছিল বা সভা-সমিতির আয়োজন করব আমরা। যা করা উচিত বলে আমি মনে করি, সেটা হলো দীর্ঘস্থায়ী কোন সামাজিক কাজের পরিকল্পনা। এটা আমাদের মনে রাখা চাই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামাটাই একমাত্র সমস্যা নয়। আমাদের প্রায় অগোচরে নিত্যই যে এক মানসিক দাঙ্গা ঘটে চলেছে তার থেকে মুক্তির উপায় না খুঁজলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কাছে আমরা পৌঁছতেই পারব না।[৬]

সাম্প্রদায়িক সমস্যা শুধুমাত্র ধর্মীয় রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সমস্যা বা সংকট নয়, এ এক ব্যক্তিপরিচয় আত্মপরিচয়ের সংকট। এই সংকট এতটাই গভীর স্তরে পৌঁছে গেছে যে, এই পরিস্থিতিতে এসে গোরার ভাষাতেই যেন অনেক বেশি চিৎকার করে বলার সময়, *আজ আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই।*[৭] যেন উচ্চারন করার সময় অসহায় ভারতবর্ষের প্রতি বলার বিষয়,

> *মা, তুমিই আমার মা। ... তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই--- শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।*[৮]

যে উপন্যাস পড়তে পড়তে তার বাক্যের সঙ্গে, বক্তব্যের ব্যঞ্জনায় শুধু আত্মা নয়, বর্তমান সমাজ সমস্যা একই ভাবে সমান্তরালে প্রবাহিত হয়, এক ভয়াবহ সংকট যা একশো বছর আগেও ছিল, একশো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তা বর্তমান সেই উপন্যাস অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না। বরং বেশিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সমাজের রূপ দ্রুত পরিবর্তনশীল হলেও সমাজের গর্ভে লুকিয়ে থাকা সমস্যার রদবদল হয়নি। অথচ হওয়া আবশ্যক। যেখানে গোরার মত এক অথবা একাধিক ব্যক্তিত্বের বড়ো প্রয়োজন। এখানেই *গোরা* প্রাসঙ্গিক। এখানেই গোরা শতবর্ষ আগের শুধু না, শতবর্ষ পরেরও নায়ক। গোরা শুধুমাত্র একটা নাম না, গোরা একটা চেতনা। বর্তমানের শুধুমাত্র নয়, গোরা চিরসারথি--- দারুণ বিপ্লবের দিনের সংকট-দুঃখত্রাতা। এখানেই গোরার প্রাসঙ্গিকতা।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২১, পৃ. ৮৬-৮৭।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আত্মশক্তি"(নেশন কী), *রবীন্দ্র রচনাবলী(দ্বিতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২০, পৃ-৬২১।

৩. প্রতিমা দেবী, *স্মৃতিচিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য(সংক ও সম্পাঃ সুনীল জানা),* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৭১।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আত্মশক্তি"(ভারতবর্ষীয় সমাজ), *রবীন্দ্র রচনাবলী(দ্বিতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২০, পৃ. ৬২২।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আত্মশক্তি"(স্বদেশী সমাজ), *রবীন্দ্র রচনাবলী(দ্বিতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২০, পৃ. ৬২৮।

৬. তদেব, পৃ. ৬২৯।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গীতাঞ্জলি", *রবীন্দ্র রচনাবলী(ষষ্ঠ খন্ড),* কলকাতা; বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, মাঘ ১৪২১। পৃ. ৬৯-৭১।

৮. তদেব, পৃ. ৭২।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কালান্তর"(লোকহিত), *রবীন্দ্র রচনাবলী(দ্বাদশ খণ্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, জৈষ্ঠ্য ১৪২২, পৃ. ৫৪৮।

১০. তদেব, পৃ. ৫৫৩।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *"গল্পগুচ্ছ"(সংস্কার),* কলকাতাঃ সাহিত্যম, কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃ. ৬৯০।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গোরা", *রবীন্দ্র রচনাবলী(তৃতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৪৩৮।

১৩. তদেব।

১৪. তদেব, পৃ. ৪৪২।

১৫. তদেব, পৃ. ৪৭২।

১৬. তদেব, পৃ. ৬৬৫।

১৭. http://en.m.wikipedia.org/wiki/2015_Dadri_mob_lynching. Accesed on 06.04.2019.

১৮. http://en.m.wikipedia.org/wiki/2017_Baduria_riots. Accessed on 06.04.2019.

১৯. http://www.google.com/amp/s/www.ndtv.com/india-news/key-accused-in-junaid-khan-mob-killing-naresh-kumar-given-interim-bail-1926414%3famp=1&akamai-rum=off. Accessed on 06.04.2019.

২০. তদেব, পৃ. ৬৬৩।

২১. তদেব, পৃ. ৬৬৪।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শান্তিনিকেতন"(তপোবন), *রবীন্দ্র রচনাবলী(সপ্তম খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, শ্রাবণ ১৪২১, পৃ. ৭০৩-৭০৪।

২৩. শ্রীরবীন্দ্র গুপ্ত, "গোরা--- একটি সমীক্ষা", পশ্চিমবঙ্গ(রবীন্দ্র সংখ্যা), বর্ষ ২০, সংখ্যা ৪৩-৪৫, ১৯৮৭, পৃ ৯৭২।

২৪. http://en.m.wikipedia.org/wiki/suicide_of_Rohit_Vemula#Background_and_death. Accessed on 06.04.2019.

২৫. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, "দাঁড়াও", *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৮১৯, পৃ. ১৬৭।

২৬. শঙ্খ ঘোষ, *অনীক,* বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ১০, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ৪।

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গোরা", *রবীন্দ্র রচনাবলী(তৃতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৬৬৪।

২৮. তদেব, পৃ. ৬৬৫।

উপসংহার

গোরা রচনার পটভূমি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট তিন বছর(১৯০৭-১৯১০) ধরে নির্মিত হয়নি। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি যেমন দ্রুত বিস্তার হচ্ছিল সমগ্র বাংলা জুড়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক ভাবনা, স্বদেশভাবনাও ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের যে সকল রাজনৈতিক লেখা আরম্ভ হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথমে *গোরা*-তে সেই ভাবনার পরিণতি রূপ লাভ করেছিল এমন কথা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ *গোরা* উপন্যাসে হিন্দু-ব্রাহ্ম সমস্যার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রূপটিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তারই মধ্যে চিহ্নিত করেছেন, সমাজের জাতিভেদের সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। *গোরা* রচনার সময়কালের রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অথবা অন্যান্য রচনা পড়লে দেখা যায়, বঙ্গভঙ্গের সময়ে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কতখানি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। উপন্যাস রচনার স্বার্থে *গোরা* রচনার পটভূমি কিছুটা পিছিয়ে নিয়ে গেলেও সাম্প্রদায়িকতার বিভেদের মধ্য দিয়ে উগ্র জাতীয়তার প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই স্বদেশচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। হিন্দু মুসলমান সমস্যার সূত্রপাত যে শুধুমাত্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় শুরু হয়েছিল তা নয়, কিন্তু এই সময়কালে ব্রিটিশ সরকারের প্ররোচনায় ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক হিংসাকে সমাজের মধ্যে ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদের অন্যতম উত্তর *গোরা*।

গোরা উপন্যাস প্রথম প্রকাশকালের শতবর্ষ অতিক্রম করে গেছে। যে সমস্যা থেকে সমাধানের সন্ধান করা হয়েছিল, তা সমাধান তো হয়নি বরং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার রূপ ক্রমে ভয়াবহ চেহারা ধারণ করেছে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ক্রমশ আরও নগ্নরূপে বরং টেনে আনা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে গোরুকে কেন্দ্র করেও

এই বিভেদকে স্পষ্ট করা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ চতুর্দিকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজেরই একদল মানুষ তীব্র ভাবে ছড়িয়ে সমাজকে কলুষিত করছে। ২০১৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের দাদরি গ্রামের নিকটে বিসরা গ্রামে বাড়িতে গোমাংস রাখা আছে সন্দেহে মহম্মদ আখলাক নামের এক ৫২ বছর বয়সী ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। চতুর্দিক রোষে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শুধু একটি ঘটনা নয়, ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই যে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল তাও এলাকার মানুষের কাছে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ২০১৮ সালের ২২শে জুন জুনেইদ খান যখন দিল্লী থেকে ট্রেনে হরিয়ানার বল্লভগড়ে ফিরছিলেন, তখন তার ব্যাগে গোরুর মাংস আছে রটিয়ে দিয়ে হিংস্র কিছু লোক ধারালো অস্ত্রের দ্বারা তাকে খুন করেন। এইসকল সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ বর্তমান শতাব্দীকে আক্রান্ত করে রেখেছে। এই সমস্যা ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এ তো গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা। আরও একটি গুরুতর সমস্যা একবিংশ শতাব্দীকে অভিশপ্ত করে রেখেছে। তা হল জাতিভেদের সমস্যা। ১৭ই জানুয়ারি ২০১৬ সালে হায়দ্রাবাদ ইউনিভার্সিটির ছাত্র রোহিত ভেমুলাকে দলিত হয়ে অপমানিত হওয়ার কারণে আত্মহত্যা করতে হয়। রোহিত ভেমুলা আত্মহত্যার জন্য এই 'সিস্টেম' অথবা 'ব্যবস্থা'কে দায়ী করেছিলেন। এখানে রাস্ট্রব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্য করার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাও এই অভিশাপের অন্তর্গত। এমনই আরো ঘটনা ভারতবর্ষের বুকে ঘটে চলেছে। এখন যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল, এই সমস্যার সমাধান কোথায়।

একবিংশ শতাব্দীর উন্নত প্রযুক্তির তথাকথিত 'সভ্য' সমাজে বসবাস করেও মানুষ জাতি এই সংস্কারের বেড়াজাল থেকে এখনো বেরিয়ে আসতে পারে নি। এ সভ্যতার ইতিহাসে বড় **সংকট।** এই সভ্যতাকে কতটা সভ্য বলা যেতে পারে, যেখানে ক্রমাগত মানুষে মানুষে মৈত্রীর পরিবর্তে বৈরিতা সৃষ্টি হচ্ছে। সভ্যতার রথ ক্রমে পিছনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যেন।

এই সভ্যতাকে কি বিশ্বায়ণের যুগে, স্মার্টফোনের যুগে, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কার ও উন্নত তথ্য-প্রযুক্তির যুগে সত্যিই একবাক্যে 'সভ্য' বলা যায়, এ নিয়ে এক ব্যাপক জিজ্ঞাসা চিহ্ন তৈরি হয়।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ এক বড় সংকটের সময়। এ নিয়ে গভীর চিন্তাও করা হচ্ছে। একদল চিন্তাশীল মানুষ এমন সংকট নিয়ে আতঙ্কিত হয়েই পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন মিটিং-মিছিলের মধ্য দিয়ে তা জনজাতির কাছে বার্তা হিসাবে পৌঁছে দেওয়ারও আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু এই দুঃসময়ের কালে এটুকুই যথেষ্ট নয় যেন। এ বিষয়ে আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পৃথিবীর বুকে বড়ো বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ যেমন মানুষের ওপরে বিশ্বাস হারাতে চাননি; তেমনি আজকের এই সংকটের মুহূর্তে আগামীর ওপর সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলাও অন্যায় হবে। আশা করা যায়, এমন অভিশপ্ত দিনের অবসান ঘটিয়ে কলুষমুক্ত ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে পারবে আগামী প্রজন্ম। শুভবুদ্ধি চেতনার যেন ধীরে ধীরে প্রসার হয়। জ্ঞানের আলো, শিক্ষার আলো এই ভারতবর্ষকে পবিত্র করে গড়ে তুলুক, এটিই প্রার্থিত। দাঙ্গা-হাঙ্গামার জটিলতা, মানুষে মানুষে বিভেদ সরে গিয়ে মৈত্রী স্থাপিত হওয়া বর্তমান সময়ে জরুরি প্রয়োজন। যে খন্ডতা সৃষ্টি হচ্ছে তা যেন শুভবুদ্ধির দ্বারা রোধ করা সম্ভব হয়, এটিই কাম্য। এ নিয়ে যে ভাবা হচ্ছে না তা নয়, তবে, এই ভাবনাকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ভীষণ জরুরী। যে সময়ে ভাবলে এই বিষয়টি এতটাও সংক্রামিত হত না, সে সময় অতিবাহিত হয়েছে। ফলে শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেতনার অগ্রসর হওয়ারও প্রয়োজন। এই ঘটনার বিলুপ্তির যে দায়বোধ সম্পর্কে চিন্তাবিদদের ভাবনা তা সম্পর্কে নিজে জানা এবং অন্যকে জানানোও আজকের দিনে যাপনের অন্যতম কর্তব্য হওয়া উচিত। ক্রমাগত এই সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতন করা বড়ো গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার শিক্ষায় পারদর্শী

করানোর সঙ্গে সঙ্গে, দেশের ভবিষ্যতের সম্পর্কে আগামী প্রজন্ম তখনই আশা রাখতে পারবে, যদি দেশের পূর্বের ইতিহাসের চেহারা সম্পর্কেও তারা জানতে পারে। সব মিলিয়ে যে আধুনিক চিন্তা গড়ে উঠবে সেখানেই এই বীভৎস রূপের কিছুটা মুক্তি মিলতে পারে বলে আশা রাখা যায়। মানুষকে তার ধর্ম-বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা নয়, মানবিকতা দিয়ে বিচার করা মূল মন্ত্র হওয়া উচিত।

এখানেই গোরার স্বর, গোরার স্বপ্ন বড়ো প্রাসঙ্গিক। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাসের বার্তা বড়ো প্রাসঙ্গিক। যেখানে উগ্র জাতীয়তা নয়, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আহ্বান এ বিশ্বকে পুনরায় আগামী প্রজন্মের বাসযোগ্য করে তোলা সম্ভব হতে পারে। গোরার স্বরে, আগামী দিনে মানুষই যেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যেখানে বলতে পারে গোরার কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা--- মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য মানুষ কেউ নয়। হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। সে আজ শুধুমাত্র ভারতবর্ষীয়। এইখানেই আজও একশো বছরের পরও *গোরা* প্রাসঙ্গিক। যেন এই কথা বলা যায়, এমন সংকটের মুহূর্তে *গোরা*-র থেকে **প্রাসঙ্গিক** অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এই চিন্তায় একমাত্র পারে, সমাজকে, কলঙ্কিত ভারতবর্ষকে পুনরায় জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করতে।

গোরা-র এই প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে জনসচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে এই বিপর্যয়ের সময়ে এটুকু আশা রাখা যায়। এই গবেষণা সন্দর্ভটির মধ্য দিয়ে, পত্র-পত্রিকা সাহিত্যের মধ্য দিয়েও এই সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এমন সম্ভাবনা রাখা যেতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গোরা,* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, বৈশাখ ১৪২১।

সহায়ক গ্রন্থ

- অঞ্জন চক্রবর্তী, *গোরা'র রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের গোরা,* কলকাতাঃ নিউ বইপত্র, ২০১৭।
- অশোক সেন, *রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, শ্রাবণ ১৪২১।*
- *অর্ণব নাগ, রামানন্দ নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ ও গোরা বিতর্ক,* কলকাতাঃ গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৮।
- ক্ষিতিমোহন সেন, *হিন্দুধর্ম,* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০৮।
- চিন্মোহন সেহানবিশ, *রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা,* কলকাতাঃ নাভানা, জানুয়ারি ১৯৮৩।
- জগদীশ ভট্টাচার্য, *জগদীশ ভট্টাচার্যের অগ্রন্থিত গদ্য*(সংকলন ও বিন্যাসঃ তপোব্রত ঘোষ), কলকাতাঃ ভারবি, ১৯৯৪।
- জ্যোতির্ময় ঘোষ, *নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ১৯৯৮।
- ঝরা বসু, *ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন,* নতুন দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬।
- ড বারিদবরণ ঘোষ, *ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা এজেন্সিস লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯০।
- তপোব্রত ঘোষ, *গোরা আর বিনয়,* কলকাতাঃ অবভাষ, জুলাই ২০১৩।
- দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত, *নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ এক বিতর্কিত সম্পর্কের উন্মোচন,* কলকাতাঃ গাঙচিল, মে ২০০৮।
- দেবেশ রায়, *দলিত(সং ও সম্পাঃ),* নতুন দিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫।
- নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ(প্রথম খন্ড),* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ১৯৮৩।

- প্রতিমা দেবী, *স্মৃতিচিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য(*সংকলন ও সম্পাঃ সুনীল জানা), কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪১৩।
- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী(দ্বিতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪১৭।
- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি,* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৭।
- প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* কলকাতাঃ ভূর্জপত্র, বৈশাখ,১৩৮৯।
- বিপান চন্দ্র, *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ,* কলকাতাঃ কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১১।
- বিবেকানন্দ, "পত্রাবলী", *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা(খন্ড-৬),* কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, আশ্বিন ১৩৮৮।
- বিবেকানন্দ, "বর্তমান ভারত", *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা(খন্ড-৬),* কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, আস্বিন ১৩৮৮।
- ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য, *ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী,* কলিকাতাঃ অশোক প্রকাশন, শ্রাবণ ১৩৮৩।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আত্মশক্তি", *রবীন্দ্র রচনাবলী(দ্বিতীয় খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, মাঘ ১৮২০।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কালান্তর"(লোকহিত), রবীন্দ্র রচনাবলী(দ্বাদশ খন্ড), কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, জৈষ্ঠ্য ১৪২২।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গল্পগুচ্ছ"(সংস্কার), কলকাতাঃ সাহিত্যম, কলকাতা বইমেলা ২০০৩।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গীতাঞ্জলি", *রবীন্দ্র রচনাবলী(ষষ্ঠ খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, মাঘ ১৪২১।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র ৬,* বিশ্বভারতীঃ কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২১।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "দেশনায়ক", *রবীন্দ্র রচনাবলী(পঞ্চম খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৪২১।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পথ ও পাথেয়", *রবীন্দ্র রচনাবলী(পঞ্চম খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৪২১।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ব্যাধি ও প্রতিকার", *রবীন্দ্র রচনাবলী(পঞ্চম খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৪২১।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ভগিনী নিবেদিতা", *রবীন্দ্র রচনাবলী(নবম খন্ড),* কলকাতাঃবিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, শ্রাবণ ১৪২১।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শান্তিনিকেতন"(তপোবন), *রবীন্দ্র রচনাবলী(সপ্তম খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, শ্রাবণ ১৪২১।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বদেশ", *রবীন্দ্র রচনাবলী(ষষ্ঠ খন্ড),* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, মাঘ ১৪২১।
- শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ,* কলকাতাঃ মন্ডল বুক হাউস, মে ১৯৭৭।
- শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ কবি চিরন্তন,* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৮৫।
- শক্তি চট্টোপাধ্যায়, "দাঁড়াও", *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৮১৯।
- শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* সম্পাঃ বারিদবরণ ঘোষ, কলকাতাঃ নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. , ২০১৮।
- স্বামী বিবেকানন্দ, *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,* কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২৮।
- Swami Saradananda, *Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda*(Edited by Barendranath Neogy), Kolkata: Bangiya Sahitya Parisad, August 2004.

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

- অনুরাধা গান্ধী, "জাতপাত বিলুপ্তির জন্য কিছু দায়িত্ব সম্পর্কে"(ভাষান্তর দুলাল কৃষ্ণ বিশ্বাস), *চেতনালহরঃ* দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২।
- অলোক রায়, "রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-ভাবনা", *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় পত্রিকা(রবীন্দ্র সংখ্যা)ঃ* বিংশতি সংখ্যা, মার্চ ২০১০।
- অমিতাভ গুপ্ত, "ধর্মসংকট", *পূর্ব(বিশেষ সংখ্যা অধর্ম):* ১৪ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৮।
- জয়দীপ ঘোষ, "'হিন্দুমুসলমানঃ প্রেক্ষিতের পুনর্বিচার", *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় পত্রিকা(রবীন্দ্র সংখ্যা)ঃ* বিংশতি সংখ্যা, মার্চ ২০১০।
- বীতশোক ভট্টাচার্য, "আধুনিক ভারত-সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ", *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় পত্রিকা(রবীন্দ্র সংখ্যা)ঃ* বিংশতি সংখ্যা, মার্চ ২০১০।
- রতন খাসনবিশ, "ধর্ম, মৌলবাদ ও রাজনীতি", *অনীকঃ* বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৩-৪, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর বিশেষ সংখ্যা ২০১৫।
- রামচন্দ্র গুহ, "দাঙ্গা", *প্রমিথিউসের পথেঃ* অষ্টম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৫।
- শঙ্খ ঘোষ, *অনীকঃ* বর্ষ ৫৪, সংখ্যা ১০, এপ্রিল ২০১৪।
- শঙ্খ ঘোষ, "ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আমরা", *পূর্ব(বিশেষ সংখ্যা অধর্ম):* ১৪ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৮।
- শান্তনু দত্ত চৌধুরী, "গোরক্ষার রাজনীতি ও হিন্দুত্ববাদ", *নয়দরজা(বিশেষ সংখ্যা গরু):* পঞ্চম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৭।
- শ্রীরবীন্দ্র গুপ্ত, "গোরা--- একটি সমীক্ষা", *পশ্চিমবঙ্গ(রবীন্দ্র সংখ্যা):* বর্ষ ২০, সংখ্যা ৪৩-৪৫, ১৯৮৭।
- শেখর সমাদ্দার, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বনে গোরা"(নাট্যরূপ): *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় পত্রিকা(রবীন্দ্র সংখ্যা)ঃ* বিংশতি সংখ্যা, মার্চ ২০১০।

- সন্দীপন সেন, "অখন্ড বাংলার সাম্প্রদায়িকতা, বাঙালির সর্বনাশ এবং রবীন্দ্রনাথ", *বাংলা জর্নালঃ* ১৬শ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৮।

অন্যান্য সহায়ক তথ্য

- http://en.m.wikipedia.org/wiki/2015_Dadri_mob_lynching. Accessed on 06.04.2019.
- http://en.m.wikipedia.org/wiki/2017_Baduria_riots. accesed on 06.04.2019.
- http://www.google.com/amp/s/www.ndtv.com/india-news-/key-accused-in-junaid-khan-mob-killing-naresh-kumar-given-interim-bail-1926414%3famp=1&akamai-rum=off.
- http://en.m.wikipedia.org/wiki/suicide_of_Rohit_Vemula#Background_and_death. Accesed on 06.04.2019.